অবহেলিত কোচবিহার প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণ

নারায়ণী সেনা বিতর্ক: শেষ অবধি রাজনৈতিক ফায়দা তুলবেন কারা?

হিঙ্গুলাবাসের হারানো ইতিহাসের সন্ধানে

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে ঘনঘন হস্তক্ষেপ কেন?

চা-শ্রমিকের মজুরি দ্রব্যমূল্যের নিরিখেই হোক

এখন ডুয়ার্স

১৬-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬। ১২ টাকা

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

তৃতীয় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (অন্তর্বর্তী সংস্করণ ১৬-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স
কতটা আনন্দে কাটবে এবার পুজো? ৬

প্রচ্ছদ কাহিনি ১
অবহেলার শিকার কোচবিহার রাজপ্রাসাদ ও ঐতিহ্য ৮

প্রচ্ছদ কাহিনি ২
নারায়ণী সেনা বিতর্কে রাজনৈতিক ফায়দা শেষ অব্দি তুলবেন কারা? ১২

প্রচ্ছদ কাহিনি ৩
কোচ রাজাদের সুপ্রাচীন রাজধানী হিঙ্গুলাবাসের হারানো ইতিহাসের সন্ধানে ১৪

খালি চোখে
উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে ঘনঘন হস্তক্ষেপ কী প্রমাণ করে? ১৮

চায়ের ডুয়ার্স
দ্রব্যের মূল্যমানের নিরিখেই চা শ্রমিকদের মজুরি চুক্তি হওয়া প্রয়োজন ২২

পর্যটনের ডুয়ার্স
বনপথের পাঁচালি ২৪

সুস্বাস্থ্যের ডুয়ার্স
আজও গরিবের বিশ্বাস-ভরসা নিশিগঞ্জের মুশুর বৈদ্যের হাসপাতাল ২৬

কেরিয়ার কথা ২৮

পাঠকের চিঠি ৩২

ডুয়ার্স স্পেশাল
ওঁ পিস ওঁ পিস ওঁ পিস ৩৬

নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৬
ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স ৩৫
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৩৮
খেলাধুলায় ডুয়ার্স ৩৯
বইপত্রের ডুয়ার্স ৪০
শখের বাগান ৪৫
ডাক্তারের ডুয়ার্স ৪৫

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ৩০
তরাই উৎরাই ৩৩
লাল চন্দন নীল ছবি ৪১

শ্রীমতী ডুয়ার্স
এবারের শ্রীমতী ৪৪
ডুয়ার্সের ডিশ ৪৫
ভাবনা বাগান ৪৬

বাকিংহ্যামের অবাক প্রাসাদ
এই মাটিকেও ছুঁলো
একশো তিরিশ বছর পরে
অভিমানের ধুলো
এই স্থাপত্যে জমছে রোজই,
ভাবনাবিহীন পড়ে
রাজবাড়ি আজ অবহেলায়
একাই স্মৃতি খোঁড়ে!
রাজকীয় বাগান নিয়েও
হায় রে টানাটানি
ঢাকছে প্রাসাদ - ইতিহাসের
গর্ব-দুয়ারখানি!
গম্বুজে আজ উড়ছে টিয়ে
ভালবাসার দায়ে
প্রমোদবাগান তকমা লাগে
হেরিটেজের গায়ে!

ছন্দে- অমিত কুমার দে
ছবিতে- তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
প্রধান চিত্রগ্রাহক অমিতেশ চন্দ
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল- ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

ডুয়ার্সের
কফি হাউস
এখন
জলপাইগুড়িতে

লাগাতার আড্ডা
গ্রুপ বৈঠক/সেমিনার
টিভিতে ম্যাচ দেখা
বাংলা-ইংরাজি পত্র-পত্রিকা
এবং গরম চায়ের মৌতাত

আর কী চাই?
বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা
রবিবার বা অন্য ছুটির দিনেও স্বাগত জানাই

আড্ডাঘর
মুক্তা ভবনের দোতলায়
মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি
facebook.com/
aaddaghar

• Buxa Tiger Reserve • Chilapata Reserve • Coochbehar Palace • Gateway to Bhutan

The Heritage Duars Welcomes You

How do you reach

Nearest Railway Station : Dalgaon-Birpara and Hasimara on Kanchankanya Express Route. Falakata and New Coochbehar on general NJP-Assam route (Uttarbanga/Teesta-Torsha/Garib Rath/Kanchanjungha/Saraighat Express).

By Road : Accessible from Siliguri/Bagdogra/NJP and Coochbehar/Alipurduar

Best of Accommodations

Madarihat Tourist Lodge

A WBTDC owned resort with AC rooms and cottages, restaurant and bar, playing ground for the kids.

Acacia Resort

An eco resort in the midst of sprawling tea gardens and wilderness of Khayerbari with marvelous stay and dining.

Jaldapara Tourist Nest

A cosy nature resort in a homely atmosphere, facilities of food-stay and indoor games-library, on the way to Totopara.

Duars Eco Wonders. Kolkata booking 18/7 Dover Lane, Kolkata 700 029 Phone 9903832123, 9830410808, 033-65360463

কতটা আনন্দে কাটবে এবার পুজো ?

যাঁরা এসময়ে কাজে বা বেড়াতে তরাই-ডুয়ার্সের নানা প্রান্তে আসছেন, নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছানোর আগে থেকেই তাঁদের চোখে পড়ছে সবুজ ধানের খেতে মিঠে হাওয়ার ঢেউ। মাঝে মধ্যেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ভেদ করে উঁকি মারতে চাইছে রোদ্দুর। দিনভর প্রচেষ্টায় কখনও শেষ মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে বেরিয়ে পড়ছে আকাশ ফুঁড়ে। ঘণ্টা কয়েকের জন্য তখন ধূসর মেঘ উধাও, এদিক ওদিক ছড়িয়ে পেঁজা তুলোর মেঘ, ঝকঝকে আলোয় চকচক করছে এঁকেবেঁকে দূরে হারিয়ে যাওয়া কালো পিচের রাস্তা, সবুজ ধানের গালিচা হলদে আলোয় জানান দিচ্ছে আসন্ন উৎসবে সম্ভবত আনন্দের হাওয়াই বইবে বাংলার এই প্রান্তে। তাই মাঠে মাঠে সোনালি ধানে নুয়ে পড়ে দেবীকে অভ্যর্থনা জানাবার দিনগুলির অপেক্ষায় রয়েছে গ্রামীণ ডুয়ার্স। বন্যার ভ্রূকুটি থেকে শেষ অবধি বোধহয় ছাড় মিলল এবার!

ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজার নাকি এবার শুয়ে আছে। এমন খারাপ অবস্থা নাকি গত দশ বছরে হয়নি। খবরের কাগজে বা টিভি চ্যানেলে বিজ্ঞাপনের দৌরাত্ম্য এখনও সে ভাবে চোখে পড়ছে না। তবু আমরা জানি আশ্বিনের দিনগুলি গড়গড় করে এগিয়ে যাবে। কর্মহীন নেশাপ্রিয় যৌবন ঢাকের কাঠির সঙ্গেই মেতে উঠবে। ভিন্ রাজ্য থেকে মজুরি খেটে মোটা রোজগার নিয়ে ঘরে ফিরবে যুবক, সঙ্গে নকল নোট পাচারের অ্যাডভান্স তার চাইতেও মোটা। আর রক্তে বয়ে নিয়ে আসা যৌন মারণ রোগ কেবল ছড়িয়ে পড়ার অপেক্ষায়।

'তোলাবাজ' বলে আজকের দিনে আর আলাদা করে কাউকে চিহ্নিত করা হয় না, তার প্রয়োজন হয় না। সরকারি ভাতা একের পর এক লাইন দিয়ে ঢুকছে পঞ্চায়েত সমিতির অ্যাকাউন্টে, বদান্যতার ইনাম ভাগাভাগি হচ্ছে পুলিশি কায়দায়, নানা স্তরে বন্টন হয়ে বৃহদাংশ অবশেষে বড় সাহেবের গোলায়। চাকরির বিজ্ঞপ্তি বেরলে তো কথাই নেই। আজকাল টাকা ছাড়া কি কিছু হয় ভাই? অতএব 'মাইন্ড' করলে চলবে না। এ জীবন কোনও কিছুতেই থেমে থাকে না। যাদের হাতে টাকা আসছে, উৎসব মাতিয়ে রাখবে তারাই। আর তাদের ঘিরে ছিটেফোঁটা মেলার আশায় মাতবে বাকিরা।

অতএব বিপণন থেমে থাকার প্রশ্নই নেই। শুধু গতবার যারা আলোয় বৃত্তে ছিল আজ তারা নেই। আজ যারা হইহুল্লোড়ে মত্ত, সামনের বার তারা নিশ্চিত হারিয়ে যাবে অন্ধকারে। উৎসব এসে চলে যাবে অন্যান্য বারের মতোই। ডুয়ার্সের দিনরাত্রি কেটে যাবে নিরুত্তাপ, একইভাবে, যুগ যুগ ধরে।

ছবিঃ দিব্যেন্দু ভৌমিক

সততার সাথে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন
লক্ষ্মী নারায়ণ বস্ত্রালয়
কোচবিহার
আপনাদের সুবিধার্থে লক্ষ্মী নারায়ণ বস্ত্রালয়-এর
এক্সটেনশন কাউন্টার হরিশপাল বিল্ডিং এর একতলায়
দেবী বরণের
সাজে সেজে উঠুন
আপনাকে সাজাতে আমরা তৈরি
প্রতি রবিবার খোলা
Call 03582 228563
বেনারসী • সিল্ক • কাতান • ইক্কত • বালুচরী • জারদৌসি
কাঞ্জীভরম • সুতি তাঁতের শাড়ি • বেডশীট • বেডকভার
সুটিং-শার্টিং ও অন্যান্য বস্ত্রের বিপুল ও আকর্ষণীয় সম্ভার।
পুজো অফার!
FREE
১০০০/- টাকার
কেনাকাটায় ১টি পার্ক
অ্যাভিনিউ সাবান ফ্রি!
FREE
৪০০০/- টাকার
কেনাকাটায় ১টি পার্ক
অ্যাভিনিউ ডিও বা ৪ টি
পার্ক অ্যাভিনিউ সাবান ফ্রি!

বেসিক ডায়েট

আচ্ছা, বেলাকোবা বেসিক ট্রেনিং কলেজ নাকি ঘন ঘন নাম পরিবর্তনে সফল? যেমন ধরুন, আগে আমরা 'বেলাকোবা বেসিক ট্রেনিং কলেজ' নামের সঙ্গে অত্যধিক পরিচিত ছিলাম কিনা। তারপর যুগ বদলাচ্ছে। নাম পালটে হল 'পিটিটিআই'। এখন শুনি নাম পালটে পুরো উলটপুরাণ। বেলাকোবা ডিআইইটি কলেজ। স্থানীয়রা অবশ্য উচ্চারণ করেন অত্যন্ত বিকৃত রূপে— 'ডায়েট'। এমন উদ্ভট নামের

অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেলাকোবার কিছু তথাকথিত রসিক মানুষ জানিয়েছেন, 'ওখানকার হস্টেলের খাবারের পরিমাণ ও ছিরি বিকট ও জঘন্য কিনা, তাই ছেলেমেয়েরা বাধ্য হয়েই ডায়েট কন্ট্রোলে রত থাকে (সে মোটা-রোগা বিনা বাছবিচারে)। অগত্যা কলেজের নামটাও...'। কিন্তু দোস্ত, নামে কী আসে-যায়! আর যদি যায়-আসে, তবে বাপু ভরতি হোস না বাপ! বেসিক ডায়েট বলেও তো একখান কথা আছে!

বলে দিলুম কিন্তু

একটা নয়, দুটো নয়, চব্বিশ ঘণ্টায় চার-চারটে রহস্যমৃত্যু আলিপুরদুয়ারে! ভাবতেই ভয় লাগছে গো! পুলিশের ভুরু থার্ড ব্র্যাকেট! নেতা-বিধায়করাও চমকে থ! এমনিতেই দুর্জনরা বলছেন, শ্যামল, সবুজ, সতেজ পরিবেশে ঢাকা আলিপুরদুয়ারে ইদানীং ধূসর প্রকৃতির গুন্ডারাজ বাড়তে শুরু করেছে। দু'পাত্র টেনে সন্ধের পর কারা জানি শহরে টলোমলো পায়ে অনাছিস্টি করার ইচ্ছেয় টহল দিয়ে বেড়ায়। মাঝেমধ্যে লাশ-টাশ পড়ে যায় শহরে। কিন্তু তা-ই বলে দিনে এক গন্ডা? না না! এই বিচ্ছিরি কাণ্ড আর সহ্য করা যাচ্ছে না। অমন চমৎকার পরিবেশের শহরখানা গোল্লায় গেলে ছেড়ে কথা কইব না বলে দিলুম, হ্যাঁ!

তালের তাল

ডুয়ার্সে তাল মন্দ ফলে না। তালের তাড়ি মানে তালমদ্য পান করে তুরীয় লোকে বিচরণ করার মতো মনিষ্যিরও অভাব নেই হেথা। আর ভাদ্দর মাসে যে তালপাকানিয়া গরম পড়ে, সেটা তো সবাই জানে। এই সময় হাটেবাজারে রাশি রাশি তাল দিয়ে পাহাড় বানিয়ে দোকান সাজিয়ে বসার লোকও মেলা। কিন্তু এবার তাল কিনতে গিয়ে তালে পড়ে টাল সামলাতে পারছেন না ক্রেতারা। তালের চেহারা একটু তন্বী হয়েছে কী গোটা পঞ্চাশ। হম্বিতম্বি করেও চল্লিশের নিচে নামানোই যাচ্ছে না। এর নিচে কুড়ি-তিরিশের তাল যে নেই তা নয়। কিন্তু ওদের দেখে মনে হবে, যেন দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ থেকে এসেছে। রসিকজন ছড়া কেটে বলছে, 'কেডা খাবি তালের বড়া/ এবার তালের মেজাজ চড়া'। এর মধ্যেই হুসলুডাঙার হাটে মিস ইউনিভার্স মার্কা তালের দাম ৬০ টাকা গোটা হেঁকে জনৈক দোকানি এম পি থ্রি-তে জোর বাজাচ্ছিলেন 'তাল সে তাল মিলা'। তালেবর লোক কিনা!

আঁধার কার্ড

'আলো আমার আলো ওগো, আলো ভুবন ভরা'— কিন্তু ভুবন আর ভরছে কই? এই গানটিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়ে তোর্সা নদীর ব্রিজের উপর রীতিমতো অন্ধকার রাজত্ব চালাচ্ছে যে। বিগত দশ বছর ধরে নাকি ব্রিজের আলো জ্বলে না। লাইটপোস্টগুলো অক্ষত আছে যদিও, তবে তাতে লাইট-ফাইটের বালাই নেই। একেবারেই ফাঁকা। এ যেন দস্যু-ডাকুদের প্রতি সাদর আমন্ত্রণ। মাঝে মাঝে অন্ধকার ফুঁড়ে তাদের আবির্ভাবও ঘটছে। এলাকাবাসী চটে গিয়ে বলছে, কাস্তে-হাতুড়ি যুগের আঁধার ঘাসফুলের যুগেও ফুরচ্ছে না। এর মধ্যেই প্রচুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে কে বা কারা জানি বলছে, অপেক্ষা বৎস! এবার এমন আলো জ্বলিবে যে, দিনের বেলা সূর্য উঠিলেও ঝাপসা দেখাইবে। অতএব অপেক্ষা। ডুয়ার্সের লোকজন আধার কার্ড পাচ্ছে। তাই হয়ত সেতুদের আঁধার কার্ড দিয়ে দিয়েছে 'গম্মেন্ট'।

সিতাই আর দমকল

সবাই জানে যে কোচবিহার জেলার সিতাই ব্লকে একটাও দমকল কেন্দ্র নেই। ব্লকের কোথাও আগুন লাগলে সেই সুদূর মাথাভাঙা থেকে ঢংঢং করে দমকলের লাল গাড়ি

আসতে আসতে কমপক্ষে দেড় ঘণ্টা। এক কথায়, অগ্নিদেবের পোয়াবারো। তা, সিতাইতে দমকল হচ্ছে-হবে ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডজন ডজন বছর কেটে গিয়েছে। সম্প্রতি শোনা গেল, দমকলের জন্য নাকি জমি জোগাড় হয়ে গিয়েছে। এবার বাকি অনুমোদন আর বরাদ্দ। বিজ্ঞজনের অনুমান, আপাতত অগ্নিদেবের দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। নিশ্চিন্তে আরও বারো বছর তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ করতে পারবেন সিতাইয়ে। কেউ কেউ বলছেন, বাংলাদেশ থেকে তো সিতাইতে অনেক কিছুই আসে। এবার সে দেশের দমকলবাহিনীর সঙ্গে একটা চুক্তি সেরে ফেললে হয় না?

সেফ স্টপ

এবার থেকে কিছু নতুন ধারণা পাওয়া গেল গো কর্তা। রাস্তায় যানজট মুক্ত করার তুলনায় নাকি যানজট বাধাতেই ডুয়ার্সের পুলিশের জুড়ি মেলা ভার। এ নিয়ে জোর হইচই শিলিগুড়িতে। নিজেদের অনুষ্ঠান সফল করতেই ব্যারিকেড দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জাতীয় সড়ক আটক করে যান চলাচল বিলকুল রুখে দিল শিলিগুড়ি পুলিশ। স্কুল বাস থেকে সেনাবাহিনীর গাড়ি— কিছুই নাকি ছাড়পত্র পায়নি। দুর্জনে তো আরও বলছে যে, অ্যাম্বুলেন্স ও দমকলকেও পুলিশের আদমিগুলো ফসকে যেতে দেয়নি। 'সেফ ড্রাইভ' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান পালন করতে মঞ্চ খাটানো হয়েছিল মাল্লাগুড়ি অবস্থিত কমিশনারেটের মাঠে। সেই উপলক্ষে শিলিগুড়ি টু শিব মন্দির 'নো ড্রাইভিং জোন' হয়ে ওঠে। রাশি রাশি গাড়ি 'সেফ মোড'-এ চলে যায়। মানে দাঁড়িয়ে যায়। তা কত্তা, গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকলেই তো সব দিক থেকে 'সেফ' থাকে, তা-ই না? 'সেফ ড্রাইভ' মানে যে গাড়ির চাকা জ্যাম— এটা না বুঝে কেন যে খামকা দোষ ধরতে যান! মনটাই ছোট্ট

আপনাদের! 'সেফ ড্রাইভ' শিখুন। মন বড় করুন। গাড়ি থামিয়ে রাখুন।

শঙ্খে শঙ্খে অমঙ্গল

সম্প্রতি এক বেয়াড়া গুজবে জেরবার হয়ে যাচ্ছিল তিস্তা থেকে সংকোশ। মহাপ্রলয় নাকি আসছেই। তার হাতে গরম প্রমাণ পাওয়ার জন্য শঙ্খে কান লাগালেই হবে। শোনা যাবে শোঁ শোঁ শব্দ। এই শব্দই নাকি প্রলয়ের ইঙ্গিত। ব্যাপারটা নিতান্তই দুধ-ভাতমার্কা। কিন্তু তালেগোলে সেটাই হয়ে গেল রীতিমতো মাংস-ভাত! ওঝা-পুরুত-মোল্লা ডেকে প্রলয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রায় হুলুস্থুলু পড়ে গেল কোথাও কোথাও। শেষে পুলিশের পাহারায় নাকি বিজ্ঞান মঞ্চের লোকজন এসে বলে-কয়ে গুজবের হাত থেকে উদ্ধার করেছে পাবলিককে। আসলে, দেশে

ডিজিটাল যুগ আসছে। গ্রামেগঞ্জে তিন দিন তালিম দিয়ে লোকজনকে 'ডিজিটালি লিটারেট' সার্টিফিকেট আর থালাবাটি উপহার দিয়ে দমাদ্দম 'উন্নতি' ঘটানো হচ্ছে। তাই সোশাল মিডিয়ায় শঙ্খের প্রলয়বার্তার আগাম খবর 'ডিজিটাল' হতেই পাবলিক খেয়ে নিয়েছে ব্যাপারটা। তবে সামলানো গিয়েছে— এটাই রক্ষে।

উভয়সংকট

একেই বলে, উভয়সংকট। একদিকে রাতের অন্ধকারে তাণ্ডব চালাল ছয়-ছয়টা হাতি। অপর দিকে ভোরবেলা... নাহ, ঘটনাটা মন দিয়ে শুনুন, থুড়ি পড়ুন। ঘটনাস্থল লাটাগুড়ি। জানা গিয়েছে যে, নিরুবাবু নামক একজন জনৈক মানুষের বাড়ি গোরুমারা জঙ্গল লাগোয়া। ভাল কথা। কিন্তু তাঁর কলাবাগানটি যে বেশ লোভনীয় তা তো আর কেউ জানে না। তাই সেই 'ভয়ানক' রাতে ছয়-ছয়টা গুন্ডা হাতি রীতিমতো হামলা চালায় তাঁর কদলীকুঞ্জে। বেজায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গোটা রাত পোহাবার পর সকালে নিরুবাবু ফ্যামিলিসুদ্ধু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার কথা ভাবতেই আবার রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। কেননা স্বস্তির তখনও কিঞ্চিৎ দেরি কিনা। ভোরবেলা নিরুবাবু যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে হাঁস-মুরগির ঘর খুলতে যান, তখন তার চক্ষু চড়কগাছ। একটিও হাঁস-মুরগি নেই! বদলে ঘরের কোণে যে বিশালাকার অজগর হে! সবই কি তার পেটে সেঁধিয়েছে? এর পর নিরুবাবু জীবন সম্পর্কে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন বলে খবর। তবে এই ইস্যুতে পাবলিক খচে টম্যাটো হয়ে গিয়েছে। বন দপ্তরের পাহারায় গাফিলতির প্রশ্ন তুলে জোর চেঁচামেচি হয়েছে অতঃপর। কিন্তু তাতে আধ ডজন হাতিরই কী, অজগরেও কী!

চলো টানি ঘানি

একদা লোকে চটে গিয়ে শত্রুর উদ্দেশে বলত, 'তোকে জেলের ঘানি টানাব।' কারণ, ব্রিটিশ আমলে কয়েদিদের দিয়ে ঘানি টানাত সরকার। সম্প্রতি রাজ্যের কারা বিভাগ আবার সেই রেওয়াজ ফিরিয়ে আনছে। জলপাইগুড়ি সংশোধনাগারে নগদ ১৩ লাখ টাকা খচ্চা করে বসানো হচ্ছে ঘানি। কয়েদিরা টানবেন। এর ফলে যে তেল উৎপন্ন হবে তা 'জেল তেল' নামে বাজারে বিকাবে কি না, সেটা জানা যায়নি। ঘানি টানার ব্যাপারে সাজাপ্রাপ্তরা কতটা উৎসাহী, সেটাও বোঝা যাচ্ছে না। তবে ডুয়ার্সে 'তোকে জেলের ঘানি টানাব' মার্কা অভিশাপ যে ফিরতে চলেছে, তা নিয়ে অবশ্যি কোনও মতভেদ নেই।

সুস্থাসুস্থ রহস্য

শামুকতলা হেল্‌থ সেন্টারে এটা প্রায়ই ঘটে। রোগীকে সেন্টারে ভরতি করিয়ে আত্মীয়-পরিজনরা অপেক্ষা করেন, সময় কাটান আকাশের নিচে। বড়জোর গাছের নিচে। এইভাবে জলে ভিজে, রোদে পুড়ে অপেক্ষা করেন তাঁরা। কারণ ওই হেল্‌থ সেন্টারে আসা রোগীর স্বজনদের বিশ্রাম নেওয়ার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই। একখানা ঘর পর্যন্ত নেই তাঁদের জন্য। তাই রোগী যখন সুস্থ হয়ে বাইরে আসেন, তখন স্বজনদের

কেউ কেউ ভিরমি খেয়ে সেন্টারে ভরতি হন। তিনি যখন সুস্থ হন, তখন আবার সুস্থ হওয়া রোগী বাইরে আকাশ কিংবা গাছতলে অপেক্ষা করে করে পুনরায় অসুস্থ। তাই একবার রোগী নিয়ে কেউ সেথা পদার্পণ করলে কিছুতেই ফিরে আসতে পারেন না। অবশ্যি এই নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই কোথাও। তাই কেউ কেউ ভাবছেন, শামুকতলা হেল্‌থ সেন্টারের সামনে তাঁবু ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা করবেন।

টুকরাণু

ডুয়ার্সের কলেজ-হস্টেলগুলোতে র‍্যাগিং-এর বাড়বাড়ন্ত। ক্যারন চা-বাগানে বাইসনের গুঁতোগুঁতি। ফের জলপাইগুড়িতে পাইথন এবং হাতেনাতে গ্রেপ্তার। রাজনৈতিক হামলার কারণে ফুলবাড়ি হাটে হাটুরে হুজ্জোতি। হলদিবাড়ি টু শিলিগুড়ি জংশন প্যাসেঞ্জারের বিনা মেঘে চেকার হানায় টিকিটহীনদের চোখে সরষে। গোরু তো ছিলই, এবার পাচারের তালিকায় ডুয়ার্সে মোষ। মাদারিহাটে যোলোজন কাঠ চোরের আত্মসমর্পণ। নাগরাকাটায় নিকাশি ব্যবস্থা চাঙ্গার দাবিতে ঐতিহাসিক পথ অবরোধ। রায়গঞ্জে জন্মের আগেই বার্থ সার্টিফিকেট তৈরি হচ্ছে বলে সংবাদ। আগ্রায় নয়, এবার পুজোয় তাজমহল হাজির মাথাভাঙার পুজোয়। চকচকায় বাইসনের দুর্দান্ত গুঁতোয় জনা তিনেক হাসপাতালে। বাপের ধমক খেয়ে কীটনাশক ভেবে ডিস্টিলড ওয়াটার খেয়ে সুইসাইড 'ফ্লপ' কিশোরীর। বীরপাড়ায় জনৈক বেড়ালের বৈরাগ্যলাভ এবং মাছে অরুচি। ডুয়ার্সে ভাদ্র মাসে নিদারুণ গরমের পর তুমুল বর্ষায় চাষবাস লাটে। জলপাইগুড়ি টু শিলিগুড়ির রাস্তা পুনরায় পাঁপড় ভাজার দিকে যাচ্ছে। লাটাগুড়ির কাছে ধরা পড়ল পেল্লায় বান মাছ।

নো টানাটানি

পাহাড়ের রানি দার্জিলিঙে এসে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশে গরম কফি সুড়ুৎ করে টেনে নেওয়ার পর আয়েশ করে সিগারেটে টান দেওয়ার সেই দিনগুলি আর রইল না হে! মাসখানেক আগে স্বাধীনতা দিবসের সক্কাল থেকে প্রকাশ্যে ধূমপানে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন জেলাশাসক। তবে কেউ কেউ বলছেন যে, বছরে ছ'মাসই তো দার্জিলিংবাসীর মুখ দিয়ে এমনিতেই ধোঁয়া বার হয়। সে ধোঁয়া শীতের না সিগারেটের, তা বুঝবে কী করে শুনি? কথাটা ভাবার মতো। তবু বলি, আইনটা মাথায় রাখিস কাকা! তা ছাড়া শরীর-স্বাস্থ্য বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। তাই সেথায় গিয়ে মুখ দিয়ে প্রাকৃতিক ধোঁয়া ছাড়া আর কোনও ধোঁয়া বার করিসনে পিলিজ!

প্রচ্ছদ কাহিনি ১

সবার অলক্ষ্যে অবহেলার শিকার কোচবিহার রাজপ্রাসাদ ও ঐতিহ্য

পৃথক রাজ্যের দাবিতে যাঁরা আজকাল সুড়সুড়ি দিয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত, তাঁরা সম্ভবত জানেনই না, সেন্টিমেন্টের কেন্দ্রবিন্দু সেই রাজপ্রাসাদ সাধারণ মানুষের অলক্ষ্যে আজ চরম অবহেলার শিকার, যার দায় বর্তায় কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থার উপরেই। বলাই বাহুল্য, কোচবিহার বলতে বাইরের মানুষ যেটুকু জানে তা ওই রাজবাড়ি। কিন্তু এই গর্বের প্রাসাদকে নিয়ে সত্যিই কি আর গর্ব করা সাজে আমাদের? কেমন আছে আমাদের রাজবাড়ি? কেমন রেখেছি আমরা তাকে? বাইরে থেকে যা ঝকঝকে সুন্দর দেখায়, ভিতরে কি সত্যিই পুরাতত্ত্বের সংরক্ষণ হচ্ছে?

মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর থেকে বহু বছর এই প্রাসাদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। কোচবিহার রাজাদের কোনও উত্তরাধিকারী না থাকায় তাদের সব সম্পত্তি ভারত সরকারের হাতে চলে যায়। সেই রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভারত সরকারের থাকলেও তখন প্রায় কোনওরকম নজরই দেওয়া হয়নি রাজবাড়ির উপর। পরবর্তীতে আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া এটি অধিগ্রহণ করল ঠিকই, কিন্তু অতদিনে প্রাসাদের বহু মূল্যবান জিনিস, এমনকি প্রাচীরের বল্লমের মতো লোহার অনেক শিক কোন ভানুমতীর মন্ত্রে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। তবে অনেকেরই অভিযোগ, অধিগ্রহণের পরও যেটুকু বাকি ছিল, তা-ও যে উধাও হওয়া বন্ধ হয়েছে তা নয়। আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অধীনে মোট ৩৬৮৬টি স্থান ও স্থাপত্য রয়েছে। কোচবিহার ও বাইরের বেশ কিছু অভিযোগের সত্যতা সরেজমিনে খতিয়ে দেখা গেল, রীতিমতো চরম অবহেলায় রয়েছে কোচবিহার রাজবাড়ি। অথচ কারওই তেমন কোনও হেলদোল নেই।

অভিযোগ ১। ৪৭,৬৮৫ বর্গমিটার আয়তনের এই প্রাসাদটি অনেকটা ইংল্যান্ডের বাকিংহাম প্যালেসের আদলে তৈরি। পুরাতত্ত্ব বিভাগের আইন অনুযায়ী এখানে একজন সুপারিন্টেন্ডিং আর্কিয়োলজিস্ট (এসএ) ও একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডিং আর্কিয়োলজিস্ট (এএসএ)-এর পদ রয়েছে। তাঁদের কোচবিহারে থাকার কথা। অথচ তাঁদের কেউই কোচবিহারে থাকেন না।

অভিযোগ ২। রাজবাড়ি দেখভালের জন্য পুরাতত্ত্ব বিভাগের তিনটি শাখা রয়েছে। হর্টিকালচার, মিউজিয়াম এবং কনজার্ভেশন, অথচ এত বড় স্থাপত্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থায়ী কর্মী মাত্র ১০ জন। অন্যান্য শাখায় অফিসার থাকলেও মিউজিয়াম বিভাগের তা-ও নেই। একজন লোয়ার ডিভিশন

> বেশ কয়েক মাস ধরে রাজবাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো খারাপ হয়ে পড়ে আছে। ছেলে ভুলানোর মতো ওগুলো লাগানো আছে ঠিকই, কিন্তু নজরদারি তো আর তাতে হচ্ছে না। ফলে এগুলোর থাকা-না থাকা সমান কথা। যদিও সাধারণ দর্শকের এই সত্য জানার কথা নয়। তেমনই হাল ইন্টারকমেরও। জানা গেল, এখানকার বেশির ভাগ ইন্টারকমগুলো দেহ রেখেছে বেশ কিছুদিন হল। সংগ্রহশালার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিনয় দাস বললেন, এগুলো আমাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, অথচ এ সম্পর্কে কিছুই জানা নেই।

ক্লার্ককে দিয়ে ওই বিভাগের সব কাজ চালানো হচ্ছে বলে জানা গেল। শুধু তা-ই নয়, সংগ্রহশালার চাবি থেকে শুরু করে সমস্ত বন্ধ ঘর, অস্ত্রাগারসহ সিংহদুয়ারের ও রাজবাড়ির পিছনের গেটের চাবিও নাকি ওই কর্মীর কাছেই থাকে। একজন সামান্য কর্মচারীর কাছে এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ চাবি কী করে থাকতে পারে, তার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে।

অভিযোগ ৩। বেশ কয়েক মাস ধরে রাজবাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো খারাপ হয়ে পড়ে আছে। ছেলে ভুলানোর মতো ওগুলো লাগানো আছে ঠিকই, কিন্তু নজরদারি তো আর তাতে হচ্ছে না। ফলে এগুলোর থাকা-না থাকা সমান কথা। যদিও সাধারণ দর্শকের এই সত্য জানার কথা নয়। তেমনই হাল ইন্টারকমেরও। জানা গেল, এখানকার বেশির ভাগ ইন্টারকমগুলো দেহ রেখেছে বেশ কিছুদিন হল। এ সম্পর্কে জানতে চাইলে সংগ্রহশালার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিনয় দাস বললেন, এগুলো আমাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, অথচ এ সম্পর্কে কিছুই জানা নেই। এই রাজবাড়ির দায়িত্ব যাঁর উপর, সেই সুপারিন্টেন্ডিং আর্কিয়োলজিস্ট শান্তনু মাইতি টেলিফোনে কলকাতা থেকে বললেন, বিষয়টি আমার জানা নেই, অবশ্যই খোঁজ নিয়ে দেখব। অতএব এঁদের দায়িত্ববোধের বহর ও রাজবাড়ির সুরক্ষাব্যবস্থা কতটা মজবুত তা সহজেই অনুমেয়।

অভিযোগ ৪। নৈমিত্তিক কর্মী দিয়েই বস্তুত চলছে রাজবাড়ির সমস্ত কাজকর্ম। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মচারীর কাছ থেকে জানা গেল, তাঁদের এই সামান্য মাইনে, অথচ কাজ সবই করতে হচ্ছে, কিন্তু এরিয়ার পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শাখায় বিপরীতধর্মী ঘটনা। কোনও দপ্তরের নৈমিত্তিক কর্মীরা এই টাকা পান, আবার কোনও দপ্তরে পান না— এই অসাম্য তাঁদের মেনে নিতে হচ্ছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও ফল হচ্ছে না।

অভিযোগ ৫। রাজবাড়ির পিছনের দিকে পার্কিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা নোটিশ দিয়ে জানানো সত্ত্বেও এক শ্রেণির কর্মচারী রাজবাড়ির পোর্টিকো বা গাড়িবারান্দার সামনে বাইক, স্কুটার, সাইকেল রেখে দেয়, যা খুবই দৃষ্টিকটু ও নিয়ম বহির্ভূত।

অভিযোগ ৬। রাজবাড়ির দরবার হল রং করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু দরবার হলের আসল রং যেমনটা ছিল, তেমন হয়নি বলে পুরনো লোকেদের অভিযোগ। এ ছাড়াও সংস্কারের নামে চুন-সুরকির গাঁথনির উপর সিমেন্টের কাজ করানোর ফলে রাজবাড়ির ক্ষতিই হয়েছে বলে অভিমত অনেকের। এ ছাড়াও বহু জায়গায়, ছাদে দেওয়ালের প্লাস্টার খসে পড়েছে। কর্তৃপক্ষ উদাসীন।

অভিযোগ ৭। সংগ্রহশালায় নামেমাত্র সাতটি ঘর খোলা রাখা হয়েছে। সার সার ঘরের বাকি সব ক'টিতেই ঝুলছে তালা। অস্ত্রাগার খোলার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত তা কার্যকর হল না। ফলে প্রচুর দুর্লভ জিনিস দেখার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন পর্যটক ও দর্শক। ২০১১ সালের ২৪ অগাস্ট তৎকালীন জেলাশাসক অস্ত্রাগারটি তুলে দেন পুরাতত্ত্ব বিভাগের হাতে। কিন্তু জানা গেল, শুধুমাত্র ফান্ডিং ও কর্মীর অপ্রতুলতার কারণে আজও বন্ধ হয়ে পড়ে আছে দুর্মূল্য এই অস্ত্রাগারটি। তাই রাজবাড়ি দেখতে গেলে নো এন্ট্রি বোর্ডের আধিক্য বেদনাদায়ক বইকি।

অভিযোগ ৮। আলোয় আলোয় একসময় সেজে উঠেছিল কোচবিহার প্যালেস। রাতের সেই আলোকসজ্জা দেখে মুগ্ধ হত সকলে। আজ প্রায় ৬/৭ মাস হল প্রাসাদে সেই আলো আর জ্বলে না। শোনা যাচ্ছে, রাজবাড়িতে 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' চালু করার উদ্যোগ আবার নেওয়া হচ্ছে, সেও অবশ্য অনেক দূরের পথ।

অভিযোগ ৯। সংগ্রহশালার মধ্যে ঘুরতে গেলেই চোখে পড়বে বিলিয়ার্ড রুমের পাশে অ্যানথ্রোপলজিক্যাল গ্যালারির দুরবস্থা। দুটো ঘরের মাঝে টয়লেটের জন্য একদিকের দেওয়ালে নোনা ধরে পলেস্তারা খসে পড়ছে। এ নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেও কোনও ফল হয়নি বলে অভিযোগ এক শ্রেণির কর্মীদের। এ বিষয়ে পুরাতত্ত্ব বিভাগকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল কোচবিহার হেরিটেজ সোসাইটির পক্ষ থেকে। তাতে কোনও কাজ তো হয়ইনি, কোনও উত্তরও আসেনি বলে অভিযোগ করলেন সোসাইটির সম্পাদক অরূপজ্যোতি মজুমদার।

অভিযোগ ১০। শতাব্দীপ্রাচীন এই প্রাসাদের বেশ কিছু ঘরের দেওয়ালে ফুল-লতাপাতার কাজ করা ওয়ালপেপার লাগানো ছিল। কয়েকটি ঘরের থেকে সেগুলো তুলে ফেলে দিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমতো রং করানোর অভিযোগ বহু পুরনো। আবার বছর দুয়েক আগে বাকি দুটো ঘরের দেওয়ালের নষ্ট হওয়া ছবি পুনরুদ্ধার করার নামে একটা প্রহসন করলেন পুরাতত্ত্ব কর্তৃপক্ষ— এমনই অভিযোগ উঠেছে নানা মহলে। জানা গিয়েছে, সেই সময়ে এই চিত্রগুলো করা হয়েছিল আর্থ কালার দিয়ে। কিন্তু জানা সত্ত্বেও স্থানীয় শিল্পীদের দিয়ে অ্যাক্রেলিক কালার ব্যবহার করে ওই নকশাগুলো নতুন করে তোলার কাজ করানো হয়েছে। অনেকেই বলছেন, ওগুলো নাকি ইতিমধ্যেই নোনা ধরে আবার নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

অভিযোগ ১১। রাজবাড়ির সংরক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন পঙ্কজ দাস। জানালেন, তিনি আসার পর রাজবাড়ি রং করানোর কাজ হয়েছে। এখানকার বিভিন্ন সমস্যার কথা এসএ-কে জানানো হয়েছে। তিনি কোচবিহার দর্শনে এলে এসব সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়ত হবে। তবে তিনি অভিযোগ করলেন, রাজবাড়ির পিছনের দিকের জমিটা পাওয়া গেলেও এখনও পর্যন্ত সেখানে বাউন্ডারি ওয়াল দেওয়া যাচ্ছে না। পিএইচই-র লোকজন তাঁদের জমির উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করায় সেখানে যথেষ্ট সমস্যা হচ্ছে। ওই জমিতে কিছুদিন আগে একটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। বাউন্ডারি ওয়াল দিতে পারলে এইসব সমস্যার হাত থেকে মুক্ত হওয়া যেত। ওই জমিতে তাঁদের একটি গোলাপবাগান করার পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু লোকজন তাঁদের জমিকে পাবলিক রোডের মতো ব্যবহার করছে, যা অবিলম্বে বন্ধ না করতে পারলে সমস্যা আরও বাড়বে।

অভিযোগ ১২। আর-একটি অভিযোগ শোনা গেল অনেকের মুখেই। তা হল, রাজবাড়ির দোতলায় নাকি চালু আছে দু'টি গেস্ট রুম। সেখানে নাকি মাঝেমধ্যেই রাজকীয় আতিথেয়তা গ্রহণ করে থাকেন উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও তাঁদের মহামান্য অতিথিরা। যদিও এসব অভিযোগই তদন্তে 'অমূলক' প্রমাণিত হতেই পারে, কিন্তু রাজার অবর্তমানে কার ইচ্ছানুসারে এই 'অতিথিশালা' চলে, সেটাই জানার ঔৎসুক্য বাড়ে। রাজ-অতিথি হয়ে রাত কাটানো নিঃসন্দেহে রোমাঞ্চকর। কিন্তু তাহলে রাজস্থানের যোধপুর প্যালেসের মতো একাংশে পাঁচতারা হোটেল করলে ক্ষতি কোথায়? এমনই প্রশ্ন কোচবিহারবাসীদের।

অভিযোগ ১৩। আরও অভিযোগ হল যে, স্থাপত্য সংরক্ষণ করাই মূল কাজ। কীভাবে সিঙ্ক বেসিন বসানো যেতে পারে বা রান্নাঘর তৈরি করা যেতে পারে— এখানে কার মদতে এ ধরনের বেআইনি কাজ করার সাহস কেউ পায় তা অবশ্যই কর্তৃপক্ষর মাথাব্যথা। এখানে শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল মাত্র।

অভিযোগ ১৪। এসব সংরক্ষিত পুরাতাত্ত্বিক সৌধের প্রধান ফটক খোলায় কিছু নিষেধাজ্ঞা থাকে বলে জানা যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেসব নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো লোকজনের জন্য সদর দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং গাড়ি নিয়ে রাজবাড়ির ভেতরে ঢোকার অনুমতি না থাকলেও তা করা হয় বহু ক্ষেত্রে। করেন বিশেষ একজন কর্মী। যদিও ওই কর্মী এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন।

> রাজবাড়ির নামে এখনও জমে হাজার হাজার দর্শক, পর্যটকদের ভিড়। জানা গেল, দৈনিক গড়ে হাজারের উপর পর্যটক আসেন রাজবাড়ি দেখতে। টিকিটের দাম ১৫ টাকা। বিদেশিদের জন্য ২০০ টাকা। টিকিট থেকে পুরাতত্ত্ব বিভাগের আয় কত হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। রাজাদের প্রচলিত কোচবিহার ট্রফি আজও সসম্মানে চলছে।

অভিযোগ ১৫। এ ছাড়াও রাজবাড়ির জিনিস আগেই দেদার লুট হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় কয়েকজন অভিযোগ করলেন, এখনও এখানকার দু'-একটা জিনিস এদিক-ওদিক হচ্ছে। রাজপরিবারের ব্যবহৃত বহু জিনিস— বাথটাব থেকে শুরু করে পালঙ্ক, ড্রেসিং টেবিল, বসার বাহারি টুল— এসব দামি জিনিস কোথায় উধাও হয়ে গেল কেউ বলতে পারে না। এগুলো ফিরে পাওয়ার আর কোনও সম্ভাবনা নেই। তবুও এখনও যা রয়েছে, তা-ও যদি দর্শকদের সামনে আনা যেত, তবে বাইরের জিনিস দিয়ে রাজবাড়ির সংগ্রহশালা অন্তত সাজাতে হত না। এ ক্ষেত্রে পুরাতত্ত্ব বিভাগের সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দিহান হতে হয়।

এত কিছুর পরও একটা কথা না বললে অন্যায় করা হবে, তা হল রাজবাড়ির বাগান। অসাধারণ যত্ন নিয়ে পরিচর্যা করা হচ্ছে তা রাজবাড়ির হর্টিকালচার বিভাগ থেকে, যা দেখে পর্যটকরা মুগ্ধ হতে বাধ্য। বস্তুত, রাজবাড়ির বাইরের নান্দনিকতা ও চাকচিক্য বজায় রেখে মুখরক্ষা করে চলেছেন এই একটি বিভাগের কর্মীরাই। আগের সেই সুরকির রাস্তা সিমেন্টের বাঁধানো হয়ে গিয়েছে। দু'দিকের কলাবতী ফুলেরা উধাও, কিন্তু চারদিকে সুন্দর সবুজের সমারোহ। হর্টিকালচারের দায়িত্বে আছেন বিনোদ চাঙ্গিয়া। তিনি জানান, এই বিভাগের মাত্র দু'জন স্থায়ী কর্মী। বাদবাকি সব অস্থায়ী কর্মীদের দিয়েই বাগানের সব কাজ করাতে হয়।

এসব তো গেল প্রাসাদের ভিতরের কথা। রাজবাড়ির বাইরের অবস্থাও বেশ শোচনীয়। সামান্য বৃষ্টিতে আর কোথাও জল না জমুক, রাজবাড়ির সামনে আজকাল জল অবশ্যই জমবে। নিকাশি ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অনেক জায়গায় নর্দমা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে জল একবার জমলে কয়েক দিনের আগে সেখান থেকে জল নামতে চায় না। এ ছাড়াও রাজবাড়ির সামনে 'নো পার্কিং'কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অলিখিত টোটো স্ট্যান্ড। সার সার দোকান বিভিন্ন পসরা নিয়ে। পৌরসভা আশ্চর্যজনকভাবে নীরব।

রাজবাড়ির নামে এখনও জমে হাজার হাজার দর্শক, পর্যটকদের ভিড়। জানা গেল, দৈনিক গড়ে হাজারের উপর পর্যটক আসেন রাজবাড়ি দেখতে। টিকিটের দাম ১৫ টাকা। বিদেশিদের জন্য ২০০ টাকা। টিকিট থেকে পুরাতত্ত্ব বিভাগের আয় কত হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। এখানকার রাজাদের প্রচলিত কোচবিহার ট্রফি আজও সসম্মানে চলছে। এই ট্রফির দৌলতে ভারতবর্ষের অনেকে জেনেছেন এই জেলার নাম। কোচবিহার রাজাদের অর্থানুকূল্যে আজও কোচবিহারবাসী উপকৃত হচ্ছেন। কারণ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহার মার্জারের সময় কোচবিহার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের নামে একটি টাকা সরকারকে দিয়ে গিয়েছেন, যার সুদ থেকে এই কোচবিহারের নানা উন্নতিসাধন করার কথা। অথচ আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি, এগুলোর সঠিক মূল্য দিতে পারি না। আমাদের অবহেলায় রাজাদের তৈরি করা কবিরাজবাগানের অমূল্য সব গাছ নষ্ট হয়ে পরিণত হয় বাদুড়বাগানে। রাজ-আমলের ঘর ভেঙে তৈরি হয় এস পি কোয়ার্টার। বহু ইতিহাসের সাক্ষী সাবিত্রী লজ ধ্বংসের মুখে চলে যায়। ধলুয়াবাড়ির শিব মন্দিরও তথৈবচ।

নীলকুঠির ইট খুলে নিতে নিতে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আমাদেরই চোখের সামনে। দিঘির শহর কোচবিহারের একের পর এক দিঘি বুজে যায়— আমরা চোখ বন্ধ করে থাকি। সাগরদিঘি, যা কিনা পানীয় জলের জন্য খনন করা হয়েছিল, কারও তুঘলকি সিদ্ধান্তে সেখানে শহরের নর্দমার জল এনে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়, যদিও তা পরবর্তীতে বন্ধ করা গিয়েছে। রাজার স্টেট ট্রান্সপোর্ট, রেল— সব কিছুর সুবিধা আমরা পেয়ে এসেছি। নিয়মিত যেখানে একসময় প্লেন চলত, আজ সেই বিমানের শব্দ শোনার জন্য বছরের পর বছর অবিশ্বাসী কান পেতে থাকতে হয় এখানকার মানুষকে।

রাজাদের নিয়ে, তাঁদের রাজবাড়ি নিয়ে, তাঁদের স্থাপিত স্কুল-কলেজ নিয়ে আমরা মুখে গর্ব করি, ব্যবসা করি, রাজনীতি করি। অথচ তার প্রতিই আমাদের চরম অবহেলা। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল কোচবিহারের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককে।

স্থানীয় বিধায়ক মিহির গোস্বামী জানান, গত কয়েক মাসে রাজবাড়ির ভিতর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কিছু কিছু অভিযোগ কানে এসেছে। যদিও কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনে তবু কোচবিহারের মানুষ হিসেবে শীঘ্রই একদিন রাজবাড়িতে গিয়ে অভিযোগগুলো কতটা সঠিক দেখে আসব। তারপর যা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সেই বিষয়ে চেষ্টা করব। আমাদের কোচবিহারের ঐতিহ্যকে এভাবে অবহেলায় নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

কোচবিহার নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণামূলক বই লিখছেন রণজিৎ দেব। বললেন, কোচবিহারের ইতিহাস যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, সেখানে এ ধরনের অরাজকতা কখনওই মেনে নেওয়া যায় না। পুরাতত্ত্ব বিভাগের অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এই ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাসাদের দায়িত্ব যখন তাঁরা নিয়েছে, তখন এই ঐতিহ্যকে সব দিক থেকে রক্ষা করার দায়িত্বও তাঁদের। স্বপন রায়ও বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন কোচবিহারের ইতিহাস নিয়ে। বললেন, রাজবাড়ির এ অবস্থা সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি অন্ধকারে।

বহু বছর ধরে কোচবিহারের ইতিহাস নিয়ে মেতে আছেন নৃপেন পাল। সব শুনে বললেন, আমাদের কৃষ্টি হারিয়ে যাচ্ছে— এটা খুবই দুঃখের। রাজবাড়ির নামটা নিয়েই শুধু আন্দোলন চলছে, রাজবাড়ি নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। এখানের সংগ্রহশালায় কোচবিহারের জিনিস খুব কমই আছে। যেসব জিনিস রয়েছে, তার বেশির ভাগই বাইরের। অথচ কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া রাজার মুদ্রাগুলো প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলে বহু মানুষ তা দেখার সুযোগ পেত। অস্ত্রাগার আজ পর্যন্ত খোলার কোনও নাম নেই। পুরাতত্ত্ব বিভাগকে এই উদ্যোগগুলো নিতে হবে।

জেলাশাসককে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্য বহুবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

রাজবাড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারিন্টেন্ডিং আর্কিয়োলজিস্ট শান্তনু মাইতির কাছে গোটা বিষয় সম্পর্কে সামান্যতম খবরও জানা ছিল না বলে জানান। কলকাতা থেকে টেলিফোনে বলেন, আমি মাস দুয়েক হল দায়িত্ব পেয়েছি। এ সম্পর্কে আমাকে কেউ কিছু জানায়নি। তবে দু'-একজন কর্মীর নামে অভিযোগ পেয়েছি, সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমি এর মধ্যেই কোচবিহার যাব। কেন্দ্রীয় সরকারকে কর্মী অপ্রতুলতার কথা জানানো হয়েছে, কর্মীনিয়োগ হলেই আমরা এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাব।

এত অবহেলা, অব্যবস্থার মধ্যেও এই অগাস্ট মাসেই 'আদর্শ মনুমেন্ট'-এর পালক যোগ হয়েছে কোচবিহার রাজবাড়ির মাথায়। অথচ কোচবিহার রাজবাড়ির সঙ্গে পুরাতত্ত্ব বিভাগের এহেন বৈমাত্রেয়সুলভ আচরণ যথেষ্ট পীড়া দেয়। এ নিয়ে এ রাজ্যের কোনও মানুষ, কোনও দলের মাথাব্যথা দেখা যায় না। অথচ এক ধরনের ঘৃণ্য রাজনীতি চলে কোচবিহারের 'রাজা' শব্দটাকে কেন্দ্র করে।

কর্মীদের কাছ থেকে জানা গেল, স্থানীয় সাংসদকে নাকি বহুবার রাজবাড়িতে আসার অনুরোধ করা হয়েছিল, এখানকার দুরবস্থা নিজের চোখে দেখে গিয়ে যাতে দিল্লির দরবারে জানাতে পারেন। কিন্তু তিনি কখনও আসেননি। সাংসদ সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন, অতএব এই অভিযোগ সত্য কি না, জানার উপায় নেই।

তবে কোচবিহারের জীবিত প্রবীণ বিশিষ্ট নাগরিকদের মতে, এই প্রত্যন্ত জেলার আরও অনেক দুর্দশার মতোই রাজবাড়ির দশা নিয়ে বলার মতো কেউ নেই। তাঁদের কথায় বেজে ওঠে হতাশার সুর। রাজবাড়ি হয়ত এখনও অপেক্ষায় আছে সুদিনের। স্থাপত্য এভাবে বিপন্ন হলে একদিন ইতিহাসও মুছে যাবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমরা এই দায় এড়াতে পারব কি? এবার একটু নড়েচড়ে বসার বোধহয় সময় হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সচেতন হতে হবে। কোচবিহারের ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যা একান্ত জরুরি।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

ছবিঃ প্রতিবেদক

'এখন ডুয়ার্স'-এর গ্রাহক সংক্রান্ত কথা

আমরা দুঃখিত, আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এবং কাগজে এর আগে ঘোষণা সত্ত্বেও 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক নেওয়া শুরু করতে পারিনি। তার প্রধান কারণ, প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠকের ঠিকানায় পত্রিকা পৌঁছাবার নেটওয়ার্ক আমরা এখনও তৈরি করে উঠতে পারিনি। আমরা প্রতিনিয়ত বহু ফোন এবং মেল পাই গ্রাহক হওয়ার অনুরোধ নিয়ে। সকলের কাছে আমাদের একটাই উত্তর, যেখানে যেখানে বাড়িতে/অফিসে কাগজ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেখানে বার্ষিক গ্রাহক হওয়ার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই— পত্রিকা এমনিতেই আপনার কাছে পৌঁছাবে। আর প্রত্যন্ত এলাকার পাঠকদের অনুরোধ করব, আপনারা নিকটবর্তী কাগজবিক্রেতার স্টলে আগাম বলে রাখলে 'এখন ডুয়ার্স' আপনার জন্য রাখা থাকবে। পাঠকের এই ভালবাসা মূলধন করেই আমরা এগিয়ে চলেছি। আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রকাশক

(পত্রিকা না পেলে ফোন করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে)

নারায়ণী সেনা বিতর্ক: রাজনীতিতে শেষ অব্দি ফায়দা তুলবেন কারা?

‘নারায়ণী সেনা’র পুনরাবির্ভাব, বিএসএফ ক্যাম্পের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কোচবিহার রাজ্যের সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করার সুচতুর পরিকল্পনা বলাই বাহুল্য। আপাতত এই পরিকল্পনার পিছনে বিজেপি’র মগজাস্ত্র কাজ করছে মনে হলেও আগামী দিনে পরিস্থিতি বুঝে মমতার কোনও মোক্ষম চাল সে ছবিটা পালটে দিতে পারে কি?

আগে যা ঘটেছে

কোচবিহার একদা স্বাধীন রাজ্য ছিল। ব্রিটিশ আমলে ‘নেটিভ স্টেট’-এ পরিণত হয়। ভুটানের আগ্রাসন থেকে কোচবিহার রাজ্যকে রক্ষা করার বিনিময়ে ইংরেজরা ওই রাজ্যকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। স্বাধীনতার পর শেষ অবধি কোচবিহার রাষ্ট্র ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসেবে পরিচয় লাভ করে। গ্রেটার কোচবিহারের দাবি আসলে আলাদা রাজ্য হিসেবে কোচবিহারের দাবি। ‘গ্রেটার কোচবিহার পিপল’স অ্যাসোসিয়েশন’ নামক একটি দলের সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে বংশীবদন বর্মা ‘গ্রেটার কোচবিহার’ আন্দোলন পরিচালনা করে আসছেন। এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে লাগাতার রেল অবরোধ এবং পুলিশের উপর বোমা-ঢিল নিক্ষেপ করে বংশীবদন বর্মন এবং ‘গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলন’ সংবাদ শিরোনামে উঠে এলেও ঘটনাটা নতুন কোনও বিষয় ছিল না।

২০০৫-এ ‘গ্রেটার কোচবিহার’ আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ নিয়েছিল। তখন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনজন পুলিশসহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছিল কোচবিহার শহরে। মৃতের তালিকায় একজন অতিরিক্ত এসপি ছিলেন। এর ফলে চল্লিশজন সহযোগী সমেত বংশীবদন বর্মার কারাদণ্ড হয়। জেলে থেকেই ২০০৯ সালে নির্দল প্রার্থী হয়ে লোকসভা ভোটে লড়েছিলেন বংশীবদন। ভোট পেয়েছিলেন ৩৭ হাজারের মতো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বংশীবদন এবং তাঁর সহযোগীদের ‘রাজনৈতিক বন্দি’র মর্যাদা দিলে তাঁরা সকলেই মুক্তি পান।

দশ বছর কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করে বংশীবদন বর্মা কিন্তু আন্দোলন থেকে বিরত থাকার বদলে পুনরায় ‘গ্রেটার কোচবিহার’-এর দাবি উত্থাপন করতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে গ্রেটার বাহিনী দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং বংশীবদনকে ছেড়ে অনন্ত রায়ের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে সমান্তরাল সংগঠন। লোকে বলে, হালে তেমন পানি না জোটায় বংশীবদন মরীয়া হয়ে ওঠেন সংবাদমাধ্যমের প্রথম পাতায় আসবার জন্য, যাতে রাজনৈতিক কেনাবেচার বাজারে পড়তি দাম বাড়াবার আশায়। ভোটের ঠিক মুখে এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে কোচবিহার রেল স্টেশন অবরোধ করে গ্রেটার সমর্থকরা উত্তর-পূর্ব ভারতের রেল পরিষেবা প্রায় লাটে তুলে দিয়েছিল। কয়েকদিন রাজ্য প্রশাসন কিছুটা উদাসীন মনোভাব নিয়েছিল। একই সময় কোচবিহার শহরের উপকণ্ঠে অনন্ত রায় অনুগামীদের সমাবেশ থাকায় কড়া মনোভাব নিয়ে অপ্রীতিকর কিছু ঘটিয়ে ভোটের বাক্সে বিরূপ ফল চায়নি শাসক দল। অনন্ত রায়ের মন্দির নির্মাণ সমাবেশ নির্বিঘ্নে পার হতেই বলপ্রয়োগে নামে পুলিশ। গ্রেফতার এড়াতে বংশীবদন আত্মগোপন করেন। পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে গ্রেটার সমর্থকদের কিছু সংঘর্ষের পর পুলিশ অবরোধ তুলে দিতে সফল হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয়েছিল যে, গ্রেটারপন্থীরা বড় বড় কড়াই ভরতি বোমা এনে মজুত করেছিল এবং তার বেশ কয়েকটা তারা ছুড়েছিল পুলিশের দিকে। যদিও রাশি রাশি পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে কীভাবে গ্রেটার সমর্থকরা কড়াই বোঝাই বোমা নিয়ে এল, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

মমতা কেন নরম

২০০৯ সালে নির্দল হিসেবে লোকসভার ভোটে কোচবিহার থেকে ৩৭,০০০ ভোট পেয়ে বংশীবদন বর্মা তাঁর লড়াইকে রাজনৈতিকভাবে আরও জোরদার করার ভাবনা নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন। মমতাও মুখ্যমন্ত্রিত্ব লাভ করার পর ক্রমশ বুঝতে পেরেছিলেন যে, বংশীবদনকে ‘রাজনৈতিক বন্দি’র মর্যাদা দিয়ে মুক্ত করে দিলে কোচবিহারে শাখাপ্রশাখা বিস্তারে তাঁর দলের সুবিধা হবে। কিন্তু দলভাগে বংশীবদন অপেক্ষাকৃত কমজোরি হয়ে পড়ায় তৃণমূল সে পথ থেকে সরে আসে। বিজেপি’ও অবশ্য একই পথে হাঁটে। গত বিধানসভা ভোটে দার্জিলিঙের বিজেপি সাংসদ আলুওয়ালিয়া সাহেব তাঁর ‘ইন্ডিজেনাস গ্রুপ’ তত্ত্ব খাড়া করে ‘গ্রেটার’ দলকে পরোক্ষ

সমর্থন জোগাতে শুরু করেন।

অচিরেই দেখা গেল যে, গ্রেটার দল সঙ্গী হিসেবে বিজেপি'কেই পছন্দ করছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী মোদি যখন ডুয়ার্সে প্রচারে এসেছিলেন, তখন তাঁর সভার মাঠের সিংহভাগ ভরিয়ে রেখেছিল গ্রেটার দলের পতাকাধারী সমর্থকরা। আলিপুরদুয়ার জেলাতে বিজেপি একটা আসন পেয়েও গেল। কিন্তু কোচবিহার জেলায় তৃণমূল জিতল একতরফা। গ্রেটারদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের পাশাপাশি আলুওয়ালিয়া সাহেব আদিবাসী বিকাশ পরিষদ, গোর্খাল্যান্ড— এঁদের দিকেও সহানুভূতির ফুল ছুড়ে আসছিলেন। ডুয়ার্সে বিজেপি'র খাতা খোলার জন্য এই পুষ্পনিক্ষেপের কাজটি তিনি যে চমৎকারভাবে সম্পন্ন করছিলেন, তা টের পেতে মমতার দেরি হয়নি। সময়মতো ঝোড়ো ব্যাটিং করে কোচবিহার বিজেপি'র মিত্রশক্তি গ্রেটারকে সীমানার বাইরে পাঠাতে পারলেও আলিপুরদুয়ারে বিজেপি'র খাতা খোলা আটকাতে পারেননি। যদিও কেউ কেউ মনে করেন যে, বিজেপি'র খাতা খোলা আসলে এক ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং সেটা অবশ্যই মোদিজির সঙ্গে দিদিভাইয়ের।

এবার নতুন খেলা

কোচবিহারের ভারতভুক্তি নিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৮ অগাস্ট তৎকালীন মহারাজা জগদীপেন্দ্রনারায়ণ এবং ভারত সরকারের প্রতিনিধি ভি পি মেননের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, এবং এই চুক্তির ফলে ওই বছরের ১২ সেপ্টেম্বর থেকে কোচবিহার ভারতের অংশ হয়ে যায়। চুক্তির একটি ধারা এখানে উল্লেখ করি—

'The Government of India hereby guarantees either the continuance in service of the permanent members of the Public Services of Cooch Behar on conditions which will not be less advantageous than those on which they serving before the date on which the administration of Cooch Behar is made to the Government of India or the payment of reasonable compensation.' (Article VIII-1)

জগদীপেন্দ্রনারায়ণ চুক্তি সংক্রান্ত ১৪টি বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে জানতে চাওয়ায় ভি পি মেনন তাঁকে একটি চিঠি লেখেন। ১৯৪৯-এর ৩০ অগাস্টে লেখা সেই চিঠিতে ১৪ নং পয়েন্ট-এর ব্যাখ্যায় তিনি লেখেন—

Government will endeavor to associate the name 'Narayan' with the Cooch Behar State Forces even after their absorption in the Indian Army.

এখানে জানিয়ে রাখা ভাল যে, নারায়ণী সেনা হল কোচবিহার রাজপরিবারের নিজস্ব সেনাবাহিনী। 'আকবরনামা' অনুসারে, মহান কোচ রাজা নরনারায়ণের বাহিনীতে ছিল ৭০০ হাতি, ৪০০০ ঘোড়া, ১০০০ নৌকা এবং দু'লক্ষ পদাতিক। নরনারায়ণের ভাই চিলা রায় ছিলেন এই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং এই বাহিনীর নাম ছিল 'নারায়ণী সেনা'। কোচবিহারের ভারতভুক্তির আগের দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই পটেল যে চিঠিটি কোচবিহারের চিফ কমিশনার নানজাপ্পাকে লিখেছিলেন, সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নারায়ণী সেনার রেজিমেন্ট থাকার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল।

গত ১৯ অগাস্ট রাজ্য সরকারের কাছে আসা একটি গোয়েন্দা রিপোর্টে জানানো হল যে, গ্রেটার দল 'নারায়ণী সেনা' নামে একটি বাহিনী তৈরি করেছে, এবং তাঁদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বিএসএফ। মাথাভাঙার কাছে শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চেনাকাটায়, বারুনি মেলার মাঠে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়েছিল ১৬ অগাস্ট থেকে। প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন ৩৮০ জন। এঁদের মধ্যে ৮১ জন নারী। দু'জন মহিলা জওয়ান ও একজন ইনস্পেক্টরসহ মোট চারজন প্রশিক্ষক হাজির ছিলেন। ২০ অগাস্ট পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলেছিল। সংবাদমাধ্যমে প্রশিক্ষণের ছবিও দেখা যায়। বিএসএফ অবশ্য ঘটনাটিকে 'গ্রামবাসীদের দাবি' বলে লঘু করার চেষ্টা করে এবং জানিয়ে দেয় যে, তারা কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্রশ্রয় দেয় না। গ্রেটারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'নারায়ণী রেজিমেন্ট'-এ যোগদান করার জন্য ছেলেমেয়েরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। এর সঙ্গে দেশবিরোধী কোনও ধারণা যুক্ত নেই।

সন্দেহ নেই যে একটি মোক্ষম জায়গা থেকে ফের খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনার চার মাস আগে আলুওয়ালিয়া সাহেব কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি লিখে 'কোচ রাজবংশী'দের জন্য আলাদা রেজিমেন্ট গঠনের প্রস্তাব তো দিয়েইছিলেন। আলুওয়ালিয়া সাহেব নিজেও প্রকাশ্যে বলেছেন যে, উক্ত প্রশিক্ষণের মধ্যে 'অন্যায়' কিছু নেই।

কোচবিহার জেলার ৮৯ শতাংশ মানুষ রাজবংশী। গ্রেটার কোচবিহারের সমর্থকরা সকলেই রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। এর আগে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা এবং বর্তমান জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার জেলা নিয়ে যে 'কামতাপুর' রাজ্যের দাবি তোলা হয়েছিল, সেটাও ছিল রাজবংশী জনগোষ্ঠীর দাবি। বস্তুত, ইতিহাসের স্বাধীন কোচবিহার হল কোচ-রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সাম্রাজ্য। তাই 'নারায়ণী সেনা'র সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের মানুষের অন্তরের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। কিন্তু তাঁরা কখনওই ভারত রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ভাবেন না।

এটা ঠিক কথা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে 'নারায়ণী রেজিমেন্ট' হতেই পারে। তা হলে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া বল্লভভাই পটেলের প্রতিশ্রুতিও পালিত হবে। সেই রেজিমেন্টে কোচ-রাজবংশী যুবক-যুবতীরা যোগদান করলে ডুয়ার্সের অর্থনীতিও উপকৃত হবে। তাই বিজেপি বিষয়টা নিয়ে উৎসাহী হয়ে উঠতেই পারে। অন্য দিকে, রাজবংশীরা পঞ্চানন বর্মার নির্দেশে উনিশ শতকের শেষ ভাগে নিজেদের 'হিন্দু ক্ষত্রিয়' হিসেবে চিহ্নিত করে উপবীত ধারণ করেছিল। ডুয়ার্সে এই সম্প্রদায়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দুত্বনির্ভর বিজেপি স্বাভাবিক কারণেই এই 'নারায়ণী' সেন্টিমেন্টকে সুচতুরভাবে কাজে লাগাতে তৎপর হতে দেরি করেনি। সীমান্তে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে এবং তৃণমূলের সংখ্যালঘু তোষণের প্রাবল্যের বিরুদ্ধে সবার অলক্ষ্যে বিজেপির জনমত ও বাহিনী দুই-ই গড়ে তোলার প্রয়াস বলেও এটিকে ব্যাখ্যা করছেন অনেকে। কিন্তু মমতাকে অন্ধকারে রেখে তারা কাজটি শুরু করে খুব একটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়নি। বিষয়টা টের পেতেই মমতা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন, এবং আপাতত গোটা ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়েছে। কিন্তু আপাত চাপা পড়লেও এই সেন্টিমেন্ট যে বর্তমান শাসক-বিরোধী শক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে অচিরেই তা সহজেই অনুমেয়, যা ভবিষ্যতে হাত মেলাবে বিজেপির মতো দলের সঙ্গেই। অনেকেরই ধারণা, বামপন্থী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার খেলায় মেতে মমতা সে পথ আরও প্রশস্ত করে দিচ্ছেন।

আবার অনেকের মতে, ভবিষ্যতে মমতা নিজেই 'নারায়ণী রেজিমেন্ট' গঠনের জন্য বিজেপি'কে চাপ দেবেন কি না সেটাই দেখার। কারণ নিজের রাজ্যে বিজেপি'কে ফাঁকা মাঠে কোথাও গোল দিতে দেবেন না তিনি। বিশ্লেষকদের ধারণা যে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে এককভাবে বিজেপি'র ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের সঙ্গে দর কষতে অসুবিধা হবে না তাঁর। আর যদি কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে, তবে মমতার পক্ষে 'নারায়ণী রেজিমেন্ট'-এর দাবি উত্থাপন করা অনেক নিরাপদ হবে। অর্থাৎ 'নারায়ণী' তাস সময়মতো খেলে বিজেপি'র উপরে টেক্কা হয়ত তিনিই মারবেন।

বৈকুণ্ঠ মল্লিক

কোচ রাজাদের সুপ্রাচীন রাজধানী হিঙ্গুলাবাসের হারানো ইতিহাসের সন্ধানে

উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত তিন নদী রায়ডাক, সংকোশ এবং তিস্তা। সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই নদীগুলি ভাঙাগড়ার নিপুণ খেলায় ইতিহাস গড়ছে, ভাঙছে। বন্যায় কোনও সময়ে তলিয়ে যাচ্ছে গ্রাম, মানুষ হচ্ছে বিপন্ন, আবার নদীভাঙনে হারিয়ে যাচ্ছে ইতিহাস। উত্তরবঙ্গের এই বিখ্যাত রায়ডাক নদীর করাল গ্রাসেই তলিয়ে গিয়েছে ইতিহাস। সেই হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে তুলে আনার তাগিদেই একদিন বেরিয়ে পড়েছিলাম আলিপুরদুয়ার শহরের শামুকতলার পথ ধরে, হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের সন্ধানে কোহিনুর চা-বাগানে, সুপ্রাচীন নল রাজার গড়ে, রায়ডাকের পাড়ে ছিপড়ার জঙ্গলে। সঙ্গী হয়েছিলেন শোভেনদা। আলিপুরদুয়ারের শ্রদ্ধেয় শোভেন সান্যাল। ইতিহাসকে জানার অদম্য আগ্রহ নিয়ে যিনি বহু পত্রপত্রিকায় বহু বিষয় নিয়ে দিঙ্‌নির্দেশ করেছেন। কালজানি নদীর ভয়ংকর বন্যায় যখন উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত শহর আলিপুরদুয়ার বন্যাবিধ্বস্ত, সেই সময়েই রায়ডাক নদীর জল সরলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা আবিষ্কার করেছিল নদীতীরে বহু পুরনো পাথরের তৈরি মন্দির, বাউন্ডারি প্রাচীর এবং গড়ের মতো কোনও কিছু অস্তিত্ব। পত্রপত্রিকায় বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি হলেও কোনওরকম আলোড়ন পড়েনি, নিছক খবর হয়েই থেকে গিয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মন সবসময়েই ইতিহাসকে খুঁজতে চায়। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে এবং 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় সাংবাদিকতার সূত্রেই বেরিয়ে পড়েছিলাম ইতিহাসের সন্ধানে। তবে সে যাত্রায় হতাশ হতে হয়েছিল। ইতিহাস খুঁজে পেয়েছিলাম পাঁচ বছর পর। বর্তমানকালের রায়ডাকের মতো অতীতেও রায়ডাকের দু'টি প্রবাহপথ ছিল। নদী সেই সময়ে মাঝেমধ্যেই এক খাত থেকে অন্য খাতে গতিপথ এবং প্রবাহপথ পরিবর্তন করত। নদীপাড়ে বাঁধ না থাকার ফলে এই অঞ্চলে বিধ্বংসী বন্যার মাধ্যমে নদীর গতিপথ বারে বারেই পরিবর্তিত হত।

এইভাবেই ধ্বংস হয় প্রাচীন রাজধানী হিঙ্গুলাবাস। উত্তরবঙ্গের দুই বিখ্যাত এবং বিশাল নদী রায়ডাক এবং সংকোশের মধ্যবর্তী ভূভাগে অবস্থিত ছিল মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজধানী হিঙ্গুলাবাস। বর্তমান আলিপুরদুয়ারের কাছে শামুকতলা-চেংমারি-ছিপড়া অঞ্চলে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ইশাক টোপ্পোকে নিয়ে প্রবেশ করেছিলাম। ইশাক রায়ডাক বাগানেই থাকত, যেখানে দেখেছিলাম বহু প্রাচীন চ্যাপ্টা ইটের তৈরি প্রাচীর প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। জায়গাটা ছিল আলিপুরদুয়ারের ছিপড়া গ্রাম থেকে ৫/৬ কিমি পূর্বে ২ নং রায়ডাক নদীর পূর্ব পাড়ে। চেচাখাতা বা বিহার নামে পরিচিত ছিল এই রাজধানী। শোভেনদার কাছ থেকে জেনেছিলাম এর ইতিহাস। তাঁর মতে, 'আলিপুরদুয়ারের শামুকতলার পূর্ব দিকে মহাকালগুড়ির কাছে ১ নং রায়ডাক নদীর পশ্চিম পাড়ে ছিপড়া গ্রামে প্রাচীন মাটির বিশাল দুর্গপ্রাকার বা গড়ের অবশেষ প্রমাণ করে যে, এখানে একসময়ে এক বিশাল প্রাচীর ঘেরা জনপদ ছিল, যার নাম ছিল চেচাখাতা। এখনও এই নামে একটি

> কালজানি নদীর ভয়ংকর বন্যায় যখন উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত শহর আলিপুরদুয়ার বন্যাবিধ্বস্ত, সেই সময়েই রায়ডাক নদীর জল সরলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা আবিষ্কার করেছিল নদীতীরে বহু পুরনো পাথরের তৈরি মন্দির, বাউন্ডারি প্রাচীর এবং গড়ের মতো কোনও কিছু অস্তিত্ব।

জনপদের অস্তিত্ব আছে।' ইতিহাসের অধ্যাপক উষাকান্ত দত্তর মতে, 'আলিপুরদুয়ার শহরের কাছে অবস্থিত এই অঞ্চল অতীতে ছিল বিখ্যাত তালুক চেচাখাতার অন্তর্গত। বিশাল রাজ্য শাসনের সুবিধার্থে বিশ্বসিংহ বর্তমান আসামের কোকরাঝাড় জেলার কোকরাঝাড় শহরের ১৩/১৪ কিমি উত্তরে সরাইডাঙা এবং চম্পাবতী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত চিকনা পর্বত থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে আসেন তাঁর নতুন রাজধানী হিঙ্গুলাবাসে।' ছিপড়ার জঙ্গলে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম, নদীর পূর্ব পাড়ে কিছু চ্যাপ্টা ইটের প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ, যা প্রমাণ করে, এই রাজপ্রাসাদ এবং পাকা বাড়িঘর অনেকটা স্থান জুড়েই ছিল। প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক অর্ণব সেনের মতে, 'রায়ডাকের বন্যার ভয়াবহতা এই অঞ্চলে বরাবরই ছিল। প্রাচীন হিঙ্গুলাবাস বা চেচাখাতাও ছিল রায়ডাকের তীরে। রায়ডাকের ভুটানে 'চুখা' নামকরণ হবার ফলে চুকারখাত বা চেকারখাত থেকে চেচাখাতা নামকরণ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অতীতে রায়ডাকেরই প্রাচীন পরিত্যক্ত খাতে গড়ে ওঠা বসতির নাম ছিল চেচাখাতা বা চেকাখাতা।' কোচবিহারের বিভিন্ন পুরনো ইতিহাস বইতে চালু এই দু'টি নাম একই জায়গাকে বুঝিয়েছে বলে মনে করা হয়।

১৯৯৭ সালে ২ নং রায়ডাক নদীর বন্যায় চেংমারি গ্রামের পশ্চিমে ২ নং রায়ডাক নদীর পাড় ভেঙে পড়ায় নদীগর্ভে এক বিশাল প্রাচীন ইটের অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখা গিয়েছিল। পরবর্তী বন্যাতেই তা আবার হারিয়ে যায়। ২ নং রায়ডাকের প্রলয়ংকরী বন্যার পর জল কমে গেলে জলের মধ্যে দেখা গিয়েছিল এক প্রাচীর রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, যা চুন-সুরকির চ্যাপ্টা ইটে তৈরি ছিল। বন্যার পরবর্তীকালে নদী পূর্ব দিকে সরে যাওয়ার ফলে প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আত্মপ্রকাশ করে। মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকা এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে পরবর্তী বর্ষাতেই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। এই প্রাসাদ রায়ডাকের বন্যার জলে ভেঙে যেতেও পারে, আবার নদীর বালিপাথরে চাপাও পড়ে যেতে পারে। নদী আরও পূর্ব দিকে পাড় ভেঙে সরে আসার ফলে যেখানে প্রাসাদটির ভগ্নাবশেষ দেখা গিয়েছিল তা এখন বিরাট বালিপাথরের

চূড়ায় পরিণত হয়েছে। বনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বনবস্তিগুলিতে খোঁজ করে বনবস্তিবাসীদের সাহায্যে গভীর জঙ্গলে দেখেছি রীতিমতো সুউচ্চ, সুবিস্তৃত বিশাল মাটির পুরনো নগর প্রতিরক্ষা প্রাকার, যা বনের আরও গভীরে বহু দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। ছিপড়া বনে যাওয়ার জন্য বনবস্তিবাসীরা নৌকোর ব্যবস্থা করেছিল, জোঁকের হাত থেকে বাঁচার জন্য দিয়েছিল হাঁটু পর্যন্ত গামবুট, সঙ্গে ছিল তির-ধনুক, বর্শা নিয়ে তিনজন যুবক ধনিয়া, বিরজু আর অভিনন্দ। ছিপড়া বনে যাওয়ার জন্য নদী পেরনোর আগে নদীর পশ্চিম পাড়ে ছিপড়া গ্রামে মাটির নগর প্রাকারটি ছিপড়া বনাঞ্চলে প্রাপ্ত নগর প্রাকারের বিচ্ছিন্ন অংশ। কারণ ১ নং রায়ডাক নদী পরবর্তীকালে তার প্রবাহপথ পরিবর্তন করার ফলে ওই নগর প্রাকার দু'টি বিচ্ছিন্ন অংশে পরিণত হয়েছে।

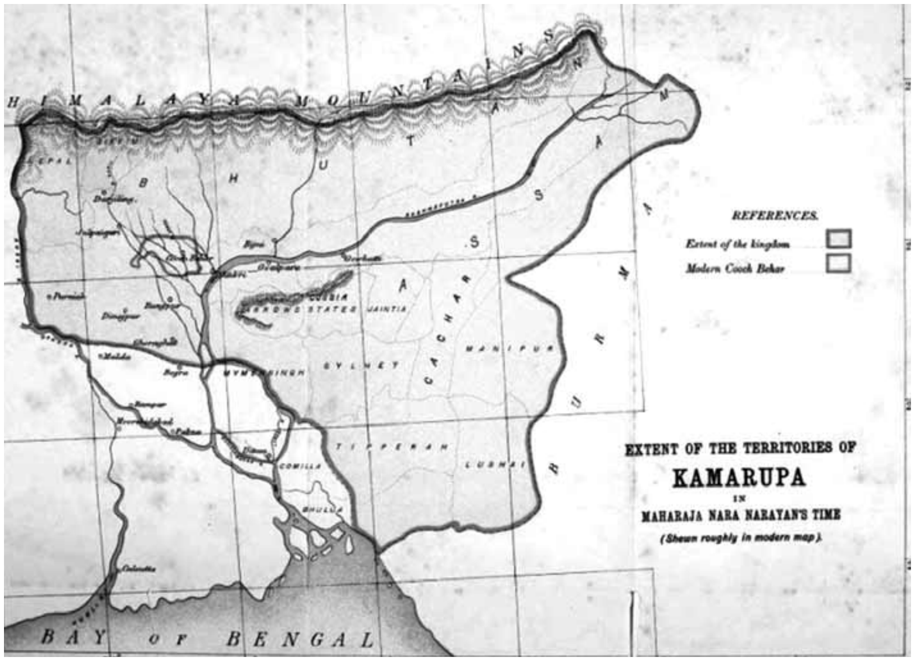

মহাকালগুড়ির কাছে রায়ডাক ১ এবং রায়ডাক ২ নং নদীর মধ্যবর্তী স্থানে ছিপড়ার গভীর বনে কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজধানী হিঙ্গুলাবাসের অস্তিত্বের চিহ্ন এখনও বর্তমান। মহাকালগুড়ির নিকটবর্তী ছিপড়া হিঙ্গুলাবাস নগরীর পশ্চিম সীমা। পূর্ব সীমা ২ নং রায়ডাক এবং সংকোশ নদীর মধ্যবর্তী চেংমারি গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার সুউচ্চ মাটির গড়ে কয়েকটি ফাঁকা জায়গা বা পথ আছে, যা অতীতে বিশালাকার রাজধানীতে ঢোকার প্রবেশপথ হিসেবে অনুমান করা হয়। প্রবেশপথের কিছু চিহ্ন এখনও বাঘদুয়ারে পাওয়া যায়, যেখানে বেশ কিছু ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন এখনও দৃশ্যমান। বাঘদুয়ারের কাছে হরিবোলার হাটের পাশে দুটো ছোট ছোট পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। নদীর দু'পাশেই সুউচ্চ মাটির গড় বা দুর্গপ্রাকার। দু'পাশে প্রায় সমতল হয়ে যাওয়া ধানখেতে প্রাচীন বিশাল চওড়া পরিখার নিদর্শন আছে।

আলিপুরদুয়ার থেকে শামুকতলা হয়ে হাতিপোতা ভুটানঘাটের দিকে যে পাকা রাস্তা গিয়েছে, সেই রাস্তা তুরতুরি নদীর সেতু পেরিয়ে কোহিনুর চা-বাগানের পাশ দিয়ে গিয়েছে। শোভেনদা, আমি বসুমতীর আলিপুরদুয়ারের সংবাদদাতা বিশ্বজিৎ আচার্যর বাইকে সফরসঙ্গী। তুরতুরি সেতু পেরলে শামুকতলার দিকে রাস্তাটার বাঁকের দু'দিকেই বেশ উঁচু বড় মাটির বাঁধ আছে। দেখলেই বোঝা যায়, বাঁধটি কেটে তার ভিতর দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। সড়ক এবং নদীপথে কোহিনুর বাগানের কাছে দৃশ্যমান মাটির বাঁধটি পূর্বে অখণ্ড থাকলেও নদী এবং পরবর্তীকালের সড়ক একে খণ্ড খণ্ড করেছে। বাঁধটি পূর্ব দিকে কোহিনুর চা-বাগানের সীমানার বাইরে আরও কিছু দূর গিয়ে ধওলাঝোরাতে গিয়েছে, যা ১ নং রায়ডাক নদীর দিকে। বাইকে আসতে গিয়ে লক্ষ করেছি, কোহিনুর চা-বাগানের সীমানায় বাঁধটা খণ্ডিত হয়েছে। তুরতুরি নদী বাঁধটিকে দ্বিখণ্ডিত করে ধার্মী নদী নাম নিয়ে শামুকতলা বাজারের পাশ দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে গিয়েছে। রায়ডাক নদীর প্রায় পাশাপাশি সমান্তরালভাবে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে তা জাতীয় সড়ক অতিক্রম করে চিকলিগুড়ির কাছে পুনরায় রায়ডাকের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। সড়ক এবং নদী মিলে কোহিনুর বাগানের কাছে দৃশ্যমান মাটির বাঁধটি তাই স্বাভাবিক কারণেই পূর্বে অখণ্ড থাকলেও নদী এবং পরবর্তীকালে সড়ক একে খণ্ড খণ্ড করেছে।

ছিপড়ার বনবস্তিতে দীর্ঘ মাটির প্রতিরক্ষা প্রাকারের অবশেষ মাটি থেকে প্রায় ১০ মিটার উঁচু। সেই উঁচু প্রাকারের উপরের অংশও প্রায় ৮ মিটারের মতো চওড়া। তবে এর অনেকটাই বড় বড় গাছপালায় ঢাকা। এই বাঁধ বা প্রাকার বনের মধ্যে প্রায় ২ কিলোমিটারের কাছাকাছি অঞ্চল জুড়ে আছে। ২ নং রায়ডাক নদী নৌকোযোগে পেরিয়ে নদীর পূর্ব তীরে চেংমারি গ্রামের কাছে বিচিত্র কয়েকটি প্রাচীন ইটের টুকরো পাওয়া গিয়েছে। আমরা যে সময়ে ভ্রমণ করেছিলাম,

১৯৯৭ সালে ২ নং রায়ডাক নদীর বন্যায় চেংমারি গ্রামের পশ্চিমে ২ নং রায়ডাক নদীর পাড় ভেঙে পড়ায় নদীগর্ভে এক বিশাল প্রাচীন ইটের অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখা গিয়েছিল। পরবর্তী বন্যাতেই তা আবার হারিয়ে যায়। ২ নং রায়ডাকের প্রলয়ংকরী বন্যার পর জল কমে গেলে জলের মধ্যে দেখা গিয়েছিল এক প্রাচীর রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, যা চুন-সুরকির চ্যাপ্টা ইটে তৈরি ছিল। বন্যার পরবর্তীকালে নদী পূর্ব দিকে সরে যাওয়ার ফলে প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আত্মপ্রকাশ করে। মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকা এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে পরবর্তী বর্ষাতেই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়।

সেই সময়কার কয়েকটি ইটের টুকরো শোভেনদা সংগ্রহ করেছিলেন। হয়ত তাঁর আলিপুরদুয়ারের বাড়িতে ড্রয়িং রুমে এখনও সযত্নে সংরক্ষিত আছে সেই সময়কার ইতিহাসের এই স্মারক। শোভেনদা দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পুরাতাত্ত্বিক বিভাগকে অনেক চিঠিও দিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের সাময়িকীতেও কলম ধরেছিলেন সরকার তথা পুরাতাত্ত্বিক বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। কিন্তু একরাশ হতাশাই সার হয়েছে। তাই কোচ রাজাদের রাজধানী এবং ইতিহাস লিখতে বসে প্রাসঙ্গিকভাবেই শোভেনদা ও বিশ্বজিৎ (বাবু)-এর নাম স্মৃতির মানসপটে বারে বারেই ভেসে ওঠে। এই অঞ্চলের ভূগোল এবং ইতিহাস শোভেনদা গুলে খেয়েছিলেন। শোভেনদা বলেছিলেন, 'পূর্বে ছিপড়া গ্রাম, ছিপড়া বনাঞ্চল এবং চ্যাংমারি অঞ্চল একই ভূখণ্ডে ছিল। তখন বর্তমান রায়ডাক নদী কুমারগ্রাম-চ্যাংমারি অঞ্চলের গোলানি নদীখাতে প্রবাহিত হয়ে সংকোশে পড়ত। এই সম্মিলিত নদীপ্রবাহ সম্ভবত পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত হত। ঘোড়ামারা, কুলকুলি ইত্যাদি নদী সম্ভবত সেই প্রাচীন প্রবাহের ধ্বংসাবশেষ। এই প্রবাহই সম্ভবত মরাখাতা অঞ্চল হয়ে মহাকালগুড়ির দক্ষিণে বর্তমানে ১ নং রায়ডাক নদীর নদীখাত ধরে তুফানগঞ্জের গড়ের পাশের ঘোড়ানদীর খাত ধরে প্রবাহিত হত।'

হিঙ্গুলাবাস, নল রাজার গড় বা নর রাজার গড় এবং আঠারোকোঠায় বারে বারে রাজধানী পরিবর্তন হবার ফলে যাতায়াত এবং সৈন্য চলাচলের সুবিধার্থে যে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল তা আজও দৃশ্যমান। ছিপড়া গ্রাম থেকে এই বাঁধের রাস্তায় বক্সা প্রায় ৪০ কিমি। চেচাখাতা থেকে বক্সা দুর্গের দূরত্ব প্রায় ৩০ কিমি। এই বাঁধ থেকে শামুকতলার চেচাখাতা দুর্গ খুবই কাছে। ভুটানিদের চেচাখাতা দুর্গ ১৭৮৩ সালে নির্মিত হয়। বক্সা দুর্গ যেহেতু হিঙ্গুলাবাস বা চেচাখাতা থেকে খুব একটা দূরে ছিল না, তাই মনে হয়, যাতায়াতের সুবিধার্থেই নরনারায়ণ রাজধানী থেকে এই প্রসারিত রাজপথ নির্মাণ করেন।

ইংরেজ পর্যটক র‍্যালফ ফিচ ১৫৮৬ সালে তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি, কোচ রাজাদের প্রাচীন রাজধানী হিঙ্গুলাবাস প্রাচীন রায়ডাক নদীর তীরেই অবস্থিত ছিল। প্রাচীন রাজধানী হিঙ্গুলাসের আয়তন ছিল যথেষ্টই বড়। এই রাজধানীতে মহারাজ বিশ্বসিংহ, নরনারায়ণ এবং চিলারায় বা শুক্লধ্বজ রাজত্ব করেছিলেন। র‍্যালফ ফিচের বিবরণ বা সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলি থেকে জানা যায়, মহাকালগুড়ির কাছে শামুকতলার উঁচু বাঁধটি ছিল সৈন্য চলাচল বা যাতায়াতের জন্য প্রশস্ত রাজপথ, যার যোগাযোগ ছিল নল রাজার গড়ের সঙ্গে। বিশ্বসিংহের প্রাচীন রাজধানী হিঙ্গুলাবাস বা প্রাচীন চেচাখাতার নগর প্রাকার বা মাটির গড়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃশ্যমান। সংকোশ এবং রায়ডাক নদী বারবার গতিপথ পরিবর্তন করার ফলে শহরের আর প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই। সুপ্রাচীন এই হিঙ্গুলাবাস যে রায়ডাক নদীর গর্ভে চলে গিয়েছে, তার যথেষ্ট প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। তথাপি রায়ডাক প্রাচীন সবকিছু ধ্বংস করলেও সুপ্রাচীন নগর প্রাকার এবং কিছু পাকা বাড়ির চিহ্ন কিন্তু এখনও দেখা যায়। ১৭৮৭ সালের প্রবল বন্যায় রায়ডাক তার গতি পরিবর্তন করে পূর্ব দিকে সরে যাওয়ার পথে বহু অঞ্চল গ্রাস করে। বহুদিন ধরেই এই অঞ্চলের পরিত্যক্ত বড় বড় নদীখাত রায়ডাকের মতো বড় কোনও নদীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। জয়ন্তী এবং অন্যান্য ছোট ছোট নদী যে রায়ডাকে এসে পড়ত, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোচ রাজাদের প্রাচীন রাজধানী হিঙ্গুলাবাস প্রাচীন রায়ডাক নদীর তীরেই অবস্থিত ছিল। প্রাচীন রাজধানী হিঙ্গুলাসের আয়তন ছিল যথেষ্টই বড়। এই রাজধানীতে মহারাজ বিশ্বসিংহ, নরনারায়ণ এবং চিলারায় বা শুক্লধ্বজ রাজত্ব করেছিলেন।

সুপ্রাচীন কোচবিহার রাজ্যের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের অধিকাংশই নদীর করালগ্রাসে বিলুপ্তপ্রায়। এইসব অঞ্চলের পরিত্যক্ত বড় বড় নদীখাত রায়ডাকের মতো কোনও সুবৃহৎ নদীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। ভূপর্যটক রেনেলের ম্যাপে সরাইডাঙা নদীর পূর্ব দিকে চেচাখাতা দুর্গ বা গ্রাম ছিল বলেই দেখানো হয়েছে। ১৭৭৯ সালে প্রকাশিত এই ম্যাপটি কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যাবলি থেকে জানা যায়, ১৭৮৭ সালের প্রবল বন্যায় রায়ডাক তার গতিপথ পরিবর্তনের ফলে নদী সুপ্রাচীন নিদর্শনের অনেক কিছুই গ্রাস করে অঞ্চলটির অস্তিত্বই বিলুপ্ত করে দেয়। ধওলাঝোরার পূর্ব দিকেই ছিপড়া বনাঞ্চলে রায়ডাকের পশ্চিম তীরে ছিপড়া গ্রামে কোচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহের রাজধানী ছিল। রেনেলের ম্যাপে সরাইডাঙা নদীর শেষ অংশের নাম সংকোশ। ১ নং রায়ডাক নদী যে আগে ছিপড়া গ্রাম এবং ছিপড়া বনাঞ্চলের মধ্যে যে ছিল না, তার প্রমাণ নদীর দুই পারেই গড়ের উপস্থিতি। স্থানীয় মেচ আদিবাসীদের ভাষায় ছিপড়া কথাটির অর্থ হল দ্বিধাবিভক্ত। অর্থাৎ নদী জায়গাটাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে— এটাই গ্রামের নামের অর্থ। এর থেকে বোঝা যায় যে, নদী এখানে আগে ছিল না। সম্ভবত এই নদী আরও উত্তরে গোলাপি খাতে প্রবাহিত হত। এই মাটির উঁচু প্রতিরক্ষা প্রাকার অনেকটা অর্ধচন্দ্রর মতো উত্তর-পূর্বের রায়ডাক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমের সংকোশ পর্যন্ত বিস্তৃত থেকে বিশ্বসিংহের রাজধানী হিঙ্গুলাবাস বা র‍্যালফ ফিচের বন্দরনগরী চেচাখাতা বা স্টিফেন ক্যাসিলার বিহার নগরীকে ঘিরে রাখত। হিঙ্গুলাবাস বা বিহার বন্যাবিধ্বস্ত হওয়ার পর মহারাজ বীরনারায়ণ আঠারোকোঠাতে তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করেন।

ভূপর্যটক স্টিফেন ক্যাসিলা ১৫২৬ সালে হিঙ্গুলাবাসকে বন্যাবিধ্বস্ত দেখেছিলেন। এই সময়েই যে হিঙ্গুলাবাস থেকে রাজধানী আঠারোকোঠায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। পর্তুগিজ পর্যটক স্টিফেন ক্যাসিলার চিঠি থেকে জানা যায়, তাঁরা যখন হিঙ্গুলাবাসে বা বিহারে আসেন ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর, তখন তোর্সার তীরে নতুন রাজধানী তৈরি হচ্ছিল। তখন তোর্সা নদী শহরের পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হত, যার বর্তমান রূপ মরা তোর্সা নামে তোর্সার পরিত্যক্ত খাত। কীর্তিনাশা মানসাই এবং তোর্সা নদী গতিপথ পরিবর্তন করে কোচ রাজাদের রাজধানীকে ধ্বংস করেছে। তাই উত্তরবঙ্গের প্রকৃত ইতিহাসচর্চার অন্যতম নিদর্শন মূল্যবান যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এখনও নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়নি তা নিয়ে উপযুক্তভাবে গবেষণার কাজ শুরু হলে ইতিহাসের অনেক অনুল্লিখিত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

গৌতম চক্রবর্তী

নাগরিকদের উন্নত পরিষেবা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মাথাভাঙা পৌরসভা

নির্মল সপ্তাহ অভিযান চলছে (২৯.০৮.২০১৬ - ৫.০৯.২০১৬)

গত অগস্ট মাসের ২৯ তারিখ থেকে সেপ্টেম্বরের ৫ তারিখ পর্যন্ত 'নির্মল সপ্তাহ অভিযানের' মাধ্যমে মাথাভাঙা শহর পরিষ্কার করা হয়। মাথাভাঙা হাসপাতাল, স্কুল, বিভিন্ন অফিস, জেলখানা, পশু হাসপাতাল, থানা, বাজার, পরিত্যক্ত এলাকা, সমস্ত ড্রেন পরিষ্কার করা হয়। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই সাফাই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতায় মাথাভাঙা ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আধুনিকীকরণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দরপত্র আহ্বান করা হয়ে গিয়েছে। ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরির আনুষঙ্গিক কাজ শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকুল্যে তৈরি এই প্রকল্পে খরচ হবে এক কোটি টাকা।

সুটুঙ্গা ও মানসাই নদীর বাঁধ বরাবর পাকা রাস্তা নির্মাণ

চৌপথীতে দ্বিতল মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ

ইমিগ্রেশন রোডে দ্বিতল মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ

চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক জানিয়েছেন— শহরের নিকাশী ব্যবস্থা সংস্কারে রাজ্য সরকারের তরফে দেড় কোটি টাকার অনুদানে নতুন পাকা ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার চলছে। আশুতোষ হলের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে ১৯ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে। কাজ চলছে। মাথাভাঙা কলেজ মোড়ে অত্যাধুনিক বাস ও ট্রাক টার্মিনাস নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। মাথাভাঙা মাছবাজারের আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহায়তায়। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। হাইড্রেন প্রকল্পে ৮ নং ওয়ার্ডে শিবশংকর সা-এর বাড়ি (মনমোহন পাড়া) থেকে শুরু হয়ে কেষ্ট সাহার বাড়ি পর্যন্ত ২৬৫ মিটার লম্বা (চওড়া ৪ মিটার) হাইড্রেন নির্মাণের কাজ চলছে পূর্ণ গতিতে। খরচ হবে ২২ লক্ষ টাকা। রাজ্য সরকারের নির্মল বাংলা প্রকল্প থেকে ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য কমপ্যাক্টর গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৯ নম্বর ওয়ার্ডে (কলেজ মোড়) একটি ম্যারেজ হল নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

চন্দন কুমার দাস
ভাইস চেয়ারম্যান

লক্ষপতি প্রামাণিক
চেয়ারম্যান

মাথাভাঙা পৌরসভা

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:12,000
Full Page, B/W: 8,000
Half Page, Colour: 7,500
Half Page, B/W: 5,000
Back Cover: 25,000
Front Inside Cover: 15,000
Back Inside Cover: 5,000
Double Spread: 20,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {19.5cm (W) X 27 cm (H)}, Non Bleed {16.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {16.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {8 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 16.5 cm (W) X 7.5 cm (H), 1/4 Page 8 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {5cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2016 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে ঘনঘন হস্তক্ষেপ কী প্রমাণ করে?

মন্ত্রীর অক্ষমতা? দপ্তরের অপ্রাসঙ্গিকতা? শাসকের অস্থির মনস্কতা? নাকি কলকাতার আধিপত্য বহাল রাখার চেষ্টা?

অনেকেই বলেন, পশ্চিমবঙ্গ, থুড়ি বাংলা বিধানসভার মোট দু'শো চুরানব্বই আসনের বিধি বা বিধান নাকি আসলে দক্ষিণ কলকাতার কয়েকটি আসনেই সীমাবদ্ধ! বাকি রাজ্যের কোথায় কবে কী ঘটবে বা ঘটবে না তা নাকি নির্ধারিত হয় ওই এলাকাতেই। রাজ্যের এক সাধারণ ভোটদাতা বা নাগরিক হিসেবে এর মর্মার্থ উদ্ধার করার প্রাজ্ঞতা নেই, তবে উত্তরের প্রান্তিক জেলার অধিবাসী হিসেবে এটুকু বুঝি, হাজার উন্নয়ন ও প্রতিশ্রুতির পরেও আজও আমরা কলকেতার বাবুদের হাতের পুতুল, তাঁরা যেভাবে নাচান, আমাদের সেইভাবেই নাচতে হয়। শত যোগ্যতা থাকলেও আমরা কলকেতায় কখনওই কলকে পাই না, তাঁরা যখন রথে চেপে আমাদের গাঁয়ে আসেন, তখন আমরা বর্তে যাই।

এককালে 'বঙ্গেশ্বর' আসতেন হুটার বাজিয়ে। সোজা ঢুকে যেতেন অরণ্য বাংলোর শীতল কুঠুরিতে। জঙ্গলের স্নিগ্ধ পরিবেশে ঢেঁকিশাল-বোরোলি মাছ-স্কচ সহযোগে ক'টা দিনের নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম নিয়ে ফিরে যেতেন। আমরা বঞ্চিত-অবহেলিত অতিথিবৎসল ডুয়ার্সবাসী তাতেই কৃতার্থ হয়ে যেতাম। লাল জামা চলে গিয়ে এবার নীল জামা। রাজধানী শহর থেকে 'অবজার্ভার' সেজে নেত্রীর দূত হয়ে তাঁরা আসেন, উত্তরের নেতাদের এলোমেলো করে দিয়ে চলে যান। অতি সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে ক্ষমতার কিঞ্চিৎ পরোক্ষ পরিবর্তন আরেকবার প্রমাণ করল, যতই সাজাও-গোজাও, আমরা আসলে পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এল উত্তরের অভাবনীয় জনসমর্থন সঙ্গে নিয়ে। আগের বারের মতোই দলনেত্রী সম্যক বুঝলেন, উত্তরের মানুষ কথা রাখে, মান রাখতে জানে। তারা উন্নয়নের যেটুকু ইঙ্গিত ও নমুনা এযাবৎ পেয়েছে, তার প্রত্যুত্তরে ঢেলে দিয়েছে ইভিএম মেশিনে। আসলে মানুষ খুঁজে পেয়েছিল নতুন 'উত্তরকন্যা' ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রকের সার্থকতা। পছন্দ হোক বা না হোক, কাজকর্মের প্রাবল্যে গত পাঁচ বছরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী পদটি এখানকার মানুষের কাছে প্রকারান্তরে 'উত্তরের মুখ্যমন্ত্রী' হয়ে উঠতে শুরু করেছিল।

এইখানটাতেই বাধল গোল। টনক নড়ে উঠল কলকেতার বাবুদের। নাহ্, এত বাড়তে দেওয়া যাবে না— এর পর উত্তরের পুতুলরা সব সজীব হয়ে উঠবে, একদিন নাগালের বাইরে চলে যাবে— কলকেতার বশ্যতা আর যে মানতে চাইবে না। অতএব শুরু সুযোগের অপেক্ষা এবং ডানা ছাঁটার অধ্যায়। একদিকে সুকৌশলে অপপ্রচার এবং তা নিয়মিত নেত্রীর কান অবধি পৌঁছে দেওয়া, অন্য দিকে সাংগঠনিক অন্তর্ঘাতের পরিকল্পিত ছক। দলটা তো ততদিনে মুখরোচক পাঁচমিশেলি, কোনও নীতির কাছে দায়বদ্ধতার বালাই নেই, তাই খেলোয়াড়ের অভাব হয়নি। নির্বাচনের বিপুল জয়লাভের পরেই উত্তরের রাজনীতিসচেতন মহল আন্দাজ করতে শুরু করেছিল, যে কোনও অজুহাতেই হোক, কোপ এবার পড়বেই। আর বাস্তবে হলও তা-ই। সবাইকে অবাক করে দিয়ে নতুন যাঁকে বসানো হল উন্নয়ন মন্ত্রীর পদে, সম্ভবত তিনি নিজেও ভীষণ অবাক হয়েছিলেন। নিজের জেলায় ঘরে-বাইরের যাবতীয় অপছন্দের শক্তিকে 'নিকেশ' করে দিয়েও যিনি এবারও সন্দিহান ছিলেন, আদৌ কোনও মন্ত্রিত্ব তাঁর বরাতে জুটবে কি না। কলকেতার 'পাওয়ারফুল' বাবুর 'তৎপরতা'য় লটারির ফার্স্ট প্রাইজ জুটল বটে, কিন্তু আবেগের আতিশয্যে প্রাথমিকভাবে তিনি বুঝেই উঠতে পারেননি, তিনি রাজধানীর উজিরদের শখের দাবার বোর্ডের ঘুঁটি হয়ে গিয়েছেন।

উন্নয়ন মন্ত্রী মানে কখনওই 'উত্তরবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী' নয়— গত পাঁচ বছরে গড়ে উঠতে

অবাক কাণ্ড হল, কমিটির মাথায় বসানো হল আগের উন্নয়ন মন্ত্রীকে, যাঁকে তিন মাস আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেসব নেতা এই মুহূর্তে ভীষণ উৎফুল্ল, তাঁরা সম্ভবত ভুলেই গিয়েছেন, যে কোনও দিন কলকেতার সেই তেনাদের পালটা চালে আবার সব পালটে যেতে পারে যে কোনও দিন।

থাকা এই 'ইমেজ' ভাঙতেই দপ্তরের ক্ষমতা ও পরিধিকে সীমিত করে দেওয়া হল। ছোট মন্ত্রীর লেজুড় ছাড়াও চা-বলয় ও খেলাধুলোর হাঁড়ি আলাদা হল, উন্নয়ন পর্ষদের উপদেষ্টা কমিটি তৈরি হল। এতেও ক্ষান্ত হলেন না কলকেতার ক্ষমতাশালীরা, তিন মাসের মধ্যে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের এক্তিয়ার ও প্রাসঙ্গিকতা আরও কমাতে তৈরি হল এগারোজনের কমিটি। অর্থাৎ মন্ত্রী একা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না, পাক্ষিক মিটিং-এ সেই কমিটিই ঠিক করবে পরবর্তী পদক্ষেপ, বরাদ্দ ফান্ডের বণ্টন ইত্যাদি। আরও অবাক কাণ্ড হল, কমিটির মাথায় বসানো হল আগের উন্নয়ন মন্ত্রীকে, যাঁকে তিন মাস আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

নিন্দুক মহল, বিরোধী গোষ্ঠীর মানুষ এতে ভীষণ মজা পেলেন। মিডিয়া 'ডানা ছাঁটা' নিয়ে নতুন স্টোরি পেল। প্রশাসনিক উৎকর্ষর বিচারে এ হয়ত 'বলিষ্ঠ' সিদ্ধান্ত হিসাবেই পরিগণিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় কয়েকটি। এক, অন্য কোনও মন্ত্রকের ক্ষেত্রে এরকম 'অদ্ভুত' সিদ্ধান্ত এর আগে নেওয়া হয়েছে কি? দুই, এই সিদ্ধান্ত কী প্রমাণ করে? মন্ত্রীর অযোগ্যতা? তা কি মাত্র তিন মাসেই বোঝা যায়? নাকি পাঁচ বছর আগে তৈরি এই দপ্তরের অপ্রাসঙ্গিকতা অনুভব করতে শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী? এর উত্তর খুঁজতে গেলে কিন্তু সেই দাবার বোর্ডে গিয়েই হোঁচট খেতে হয়। শহর কলকেতার দপ্তরে বসে দাবার চাল ও পালটা চাল দিচ্ছেন সেইসব 'পাওয়ারফুল' বাবু— রাজা বা মন্ত্রী শেষ অবধি একটাই থাকে— দুটো নয়। দ্বন্দ্বে দীর্ণ যেসব নেতা এই মুহূর্তে ভীষণ উৎফুল্ল, তাঁরা সম্ভবত ভুলেই গিয়েছেন, যে কোনও দিন কলকেতার সেই তেনাদের পালটা চালে আবার সব পালটে যেতে পারে যে কোনও দিন। তাঁদের মনে কখনওই প্রশ্ন ওঠে না— ওপার থেকে নেতারা এপারে 'অবজার্ভার' হয়ে আসেন, তার মানে কি এপার থেকে ওপারে 'অবজার্ভার' হয়ে যাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন কোনও নেতা নেই? এ প্রশ্ন যতদিন না উঠবে, ততদিন পুতুলনাচের লগবগে পুতুল বা দাবার ঘুঁটি হয়ে থাকতে হবে আমাদের।

উত্তরায়ণ সমাজদার

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
বিশ্বনাথ বাগচি ৯৮৩২৬-৮৩৯৮৮
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯৯৩২৫৩৪৮৮৫
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৭৪৯৩৭৬৪৯৫
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

সকলকে শারদীয়ার অনেক অনেক শুভেচ্ছা
প্রাণভরা ভালোবাসা আর সেই সঙ্গে থাক
উৎসবের দিনগুলোকে ঝলমলে করতে
বি পোদ্দার মাইক্রোগোল্ড

শরৎ মানে উৎসবের কাল। বঙ্গজীবনে এই উৎসব নিয়ে আসে এক অন্য স্বাদ অন্য গন্ধ। এই সময়েই ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মেয়েরা চায় অপরূপ সাজে সেজে উঠতে। বিশেষ করে পুজোর চারটি দিন সকাল থেকে সন্ধে, পুষ্পাঞ্জলী থেকে ঠাকুর দেখা— প্রতিটি পর্বেই পোশাক যেমন ভিন্ন তার সঙ্গে অলঙ্কারও হবে মানানসই। সেই সাজে গহনাই হল বিশেষ উপকরণ। গহনা মানে স্বর্ণালঙ্কার। কিন্তু তার দাম তো প্রায় আকাশছোঁয়া। তাই সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না সবার। তা বলে কি মধ্যবিত্ত তনয়া বা বধূরা গহনার সাজে অপরূপা হবে না?

ওদের কথা ভেবেই স্বর্ণালঙ্কারের বিকল্প মাইক্রোগোল্ড এনেছিলেন বিশ্বজিৎ পোদ্দার। খাঁটি তামার মধ্যে সোনার নকশা অনুকরণ করে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে ২৩ ক্যারেট গোল্ড প্লেটেড থেকে রূপ দেওয়া হল ব্রেসলেট, নেকলেস, চেন, লকেট এমনকি মুক্তোর অলংকার। উত্তর-পূর্ব ভারতে গয়নাকে ফরমুলার খাঁচা থেকে মুক্তি দিল তাঁর নকশাকাররা। কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজার থেকে কলকাতার পার্ক সার্কাস, বিরাটি, হাওড়া সহ আসাম ও এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে গেছে **বি পোদ্দার মাইক্রো গোল্ড**-এর একাধিক শো-রুম। অবিশ্বাস্য স্বল্প মূল্যে গয়নার ফ্যাশনে এই বিপ্লব তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল আই এস ও-র স্বীকৃতি, সেই সঙ্গে গহনা তৈরির জন্য প্রথম রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে **বি পোদ্দার মাইক্রো গোল্ড**। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশে অভাবনীয় সাফল্যের কারণে খাদি গ্রামোদ্যোগ থেকে মিলেছে বিশাল সম্মান।

বি পোদ্দার মাইক্রো গোল্ড-এর এখন সুরাট, গোরখপুর, সমস্তিপুর, দিল্লি, রাজস্থান, ওড়িষা, আসাম, ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে পাইকারি ও খুচরো বিক্রি বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখন আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রেও এক বিশাল সাফল্য অর্জন করেছে এই সংস্থা এবং শারদীয়া উপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন গহনার রূপকারকে অনুকরণ করে অভাবনীয় ডিজাইন তৈরি করেছে

বি পোদ্দার মাইক্রো গোল্ড। যা আমাদের স্বপ্নের সাজকে নতুন করে গড়ে তুলবে।

অলঙ্কার শিল্পের কারিগরদের সামনেও স্বপ্নের ভবিষ্যৎ গড়ে দিচ্ছেন শ্রী বিশ্বজিৎ পোদ্দার। তাই ব্যবসা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য স্বল্প পুঁজিতে মজবুত করে নিজের জীবন গড়ে তুলুন।

P.M.E.G.P. Unit under K.V.I.C., Govt. of India

B. PODDER MICRO GOLD

AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY

স্বল্প পুঁজিতে ঘরে বসে ব্যবসায়ে ইচ্ছুকরা নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

R. N. Road, Dakshinayan Building 2nd Floor, Cooch Behar, Pin - 736101 (W.B.)
Phone: 03582-228597, 98320 92714, 8967863754 E-mail: bpmicrogold@gmail.com

দ্রব্যের মূল্যমানের নিরিখেই চা শ্রমিকদের মজুরি চুক্তি হওয়া প্রয়োজন

উত্তরবঙ্গের অন্যতম শিল্প চা-বাগিচা শিল্প। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় চা-বাগিচা শিল্পে। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট, শ্রমিক শোষণ, সরকারি উদাসীনতা, টি-বোর্ডের পরিচালননীতির ব্যর্থতায়, তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভুল নীতি এবং আন্দোলনবিমুখতায়, নেতাদের স্বজনপোষণ কার্যকলাপে আর্থ-সামাজিক সংকটে জর্জরিত চা-বাগিচা শিল্প। এই নিয়েই সমস্যা, সংকট, উত্তরণের দিশা ধারাবাহিকভাবে ‘এখন ডুয়ার্স’-এর কলামে। তুলে ধরছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা**। আজ **প্রথম পর্ব**।

জীবনসংগ্রামের পথ মসৃণ নয়। ক্রমবর্ধমান নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের দেহাতি মানুষের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদেরও নাভিশ্বাস উঠেছে। বৈদেশিক অর্থ উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম চা। তাই স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারেরই দায়িত্ব চা শিল্পে কর্মরত চা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা। এক সময়ের প্রয়াত চা শ্রমিক নেতা, বর্ষীয়ান ট্রেড ইউনিয়নিস্ট, চা-বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়নসমূহের কোঅর্ডিনেশন কমিটির আহ্বায়ক চিত্ত দে-র সঙ্গে আলাপচারিতা হচ্ছিল। চিত্ত দে-র মতে, চা শ্রমিকদের ইউনিয়ন মজুরির পরিবর্তে টাইম স্কেল দেওয়ার পক্ষপাতী। ২৫ বছর মেয়াদি টাইম স্কেল দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। মূল্য সূচকের পয়েন্টের নিরিখে চা শ্রমিকদের মজুরি দৈনিক ৩১০ টাকা হওয়া জরুরি। ১৯৪৯ সালে দেশের শূন্য সূচকের পয়েন্ট ছিল ১৮০। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০৩৩ পয়েন্টে। বর্ষীয়ান ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মূল্য সূচকের পরিসংখ্যানের উদ্ধৃতি দিয়েই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর শূন্যমানে চা শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দেওয়ার দাবি করেছিলেন। চা-বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়নের কোঅর্ডিনেশন কমিটি চা শ্রমিকদের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে টাইম স্কেলের প্রস্তাব করেছে। স্থায়ী শ্রমিকদের জন্য তারা দাবি করেছে ৩১০ টাকা, তেমনি অস্থায়ী শ্রমিকদের জন্য দাবি করা হয়েছে ২৮৫ টাকা দৈনিক মজুরি।

বিদগ্ধ সাংবাদিক সৌমেন নাগের মতে, আসলে বাঁচার অধিকার শুধুমাত্র জন্মগত অধিকার নয়, এটি একটি আইনসংগত অধিকারও। একই রকমভাবে আত্মরক্ষার অধিকারও সংবিধান দ্রবীকৃত। উত্তরবাংলার বন্ধ রায়পুর চা-বাগানের কর্মহীন শ্রমিক জিতবাহনের মৃত্যু ঘটাতে বন্দুক থেকে তপ্ত সিসা ছুড়তে হয়নি বাগিচা মালিকের পেটোয়া মাফিয়া গুন্ডাকে। জিতবাহন শ্রেণিসংগ্রাম করতে গিয়ে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মঞ্চে সেনানী হতে উপস্থিত হয়নি। সে তার চা-বাগিচার ভাঙা বাড়ির ভাঙা দাওয়ায় দিনের পর দিন এক দানা ভাতের জন্য অপেক্ষা করে শূন্য পাকস্থলীর দাবি মানতে না পেরে। ফুসফুসের শেষ রায়টুকুকে বার করে দিয়ে বাঁচার অধিকারের

সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির মুখে লাথি মেরে বিদায় নিয়েছে। আসলে সরকার নিছক দর্শকই। ট্রেড ইউনিয়নের ট্রেডের সাইনবোর্ড আছে, আন্দোলন নেই। নেতা আছে, নেতৃত্ব নেই। পথ আছে, দিশা দেখাবার জন্য পথপ্রদর্শক নেই। আইন আছে, শ্রমিকের বাঁচার জন্য আইনের দণ্ড নেই। কারখানার গেটে তালা ঝোলানোর জন্য মালিকের হাতে তালা আছে। বন্ধ তালা খোলবার জন্য সরকার ও শ্রমিকের হাতে চাবি নেই।

ওদের জীবন মানে সবুজ চা-বাগান। চা-পাতা তোলা আর অর্থ রোজগার করা। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে শুধু রাতটুকু কোনওরকমে কাটানো। দিনের বেশির ভাগ সময়টাই কেটে যায় চা-বাগানে। দুপুরে চা-বাগিচাতেই বসে কোনওরকমে দুপুরের খাওয়া সেরে নেয় প্রাণচঞ্চল বুলবুলি, বীণা, সীতা ওঁরাওরা। তাতে চা-বাগানে পাতা তুলে একটু বেশি রোজগার করা যায়। লেখাপড়ায় খুব বেশি এগতে পারেনি ওরা। পরিবার বড়, বাবার বয়স হওয়ায় কাজ করতে পারেন না। তাই বুলবুলি, বীণা, সীতা ওঁরাওদের ভরা যৌবন চা-বাগানে পাতা তুলে এভাবেই কেটে যায়, কেউ খোঁজখবর রাখেন না। ডুয়ার্সের ঐতিহ্যবাহী সবুজ চা-বাগানে ঘেরা রামশাই গ্রামের মেয়ে বুলবুলি, বীণা এবং সীতা ওঁরাওরা।

কোনওরকমে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করার পর বুলবুলি ওঁরাও আর এগতে পারেনি। ডোববাড়ি গ্রামের দিনমজুর মেন্দা ওঁরাওয়ের বড় মেয়ে বুলবুলি ওঁরাও। বয়সজনিত কারণে বাবা আর কাজ করতে পারে না বলে সেই দায়িত্বটাই এখন পালন করতে হয় বুলবুলিকে। সাত ভাইবোন তারা। মা পূর্ণিমাদেবী বুলবুলিকে চা-পাতা তোলার কাজে সহায়তা করেন। তাঁদের দু'জনের উপার্জিত অর্থেই বুলবুলিদের সাংসারিক খরচ চালিয়ে নিতে হয়। বোন প্রমীলা, ভাই অমলের লেখাপড়া হয়নি, তবে গোপাল নবম শ্রেণি ও সুনন্দ ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। বুলবুলি বিয়ে করতে আগ্রহী নয়। তাহলে সংসার চলবে কেমন করে?

রামশাই গ্রামেরই বীণা ওঁরাও পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে বন্ধ করে দিয়েছে। পাঁচ ভাইবোন ও মা-বাবাকে নিয়ে সংসার তাদের। বাবা ঝরিয়া ওঁরাও বর্তমানে কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন। মা ফুলমণিদেবীও পাতা তোলেন। ফুলমণি জানালেন, 'কী করব? দু'জনে মিলে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করি। গড়ে প্রতিদিন রোজগার ১৫০ টাকা। এ দিয়েই চলতে হয় আমাদের।'

বারোহাতি গ্রামের সীতা ওঁরাও প্রায় বারো বছর আগে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে বন্ধ করে দিয়েছে। বর্তমানে সীতা রামশাই বারোহাতি কালামাটির কাউয়াগার সাতভেন্তি গ্রামের বিভিন্ন চা-বাগানে পাতা তোলেন। সকালবেলা বাড়িতে সামান্য টিফিন খেয়ে সঙ্গে খাবার নিয়ে বেরিয়ে যান সীতা। তারপর টানা চা-পাতা তোলার পর দুপুরে চা-বাগানে বসেই খাবার খেয়ে নেন তাঁরা। তারপর আবার যতক্ষণ সম্ভব পাতা তোলার পালা। একটানা এভাবে চলার পর সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরার পালা। একসময় গ্রাম জুড়ে বিরাজ করত অভাব। এখন গ্রাম ঢাকা পড়েছে সবুজ চা-বাগানে। এলাকার অধিকাংশ জমিতে চা-চাষ হচ্ছে। চা-বাগিচায় পাতা তোলার কাজে এগিয়ে আসছেন গ্রামের মহিলা ও মেয়েরা। রামশাই, বারোহাতি, ডোববাড়ি, কালামাটি, সাতভেন্তি আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা।

'এদের সুখ আর ওদের অসুখ'। সংক্ষিপ্ত এই মন্তব্যের সারকথা হল, চায়ের তেজি বাজারের সুফলের দরুন চা-মালিকরা সুখে অর্থাৎ স্বস্তিতে থাকেন। অন্য দিকে, আর্থিক অনটনের শিকার চা শ্রমিকরা অস্বস্তিতে অর্থাৎ গভীর অসুখে আক্রান্ত। চা সাম্রাজ্যে দারিদ্রের ভয়াবহ অবস্থা। কেন্দ্র এবং রাজ্যের চিরকালীন উদ্যোগহীনতাই চা-বাগিচা শ্রমিকদের দাবি আদায়ের পুরনো পথে ঠেলে দিতে বাধ্য করছে। ভরসা হারিয়ে আবারও আন্দোলনের পথে যেতে প্রস্তুতি শুরু করেছে শ্রমিকরা। শ্রমিকরা এটা অন্তত বুঝে গিয়েছে, অতীতের মতো আন্দোলন ও ধর্মঘট ছাড়া কখনওই মালিকরা রফায় আসবেন না। সরকারের ভূমিকায় স্বচ্ছতার অভাবই মালিকদের একগুঁয়ে হতে বরাবর সাহায্য করে গিয়েছে বলে মনে করেন শ্রমিক নেতা অলোক চক্রবর্তী।

চা উৎপাদনে উত্তরবঙ্গের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। সারা বিশ্বে দার্জিলিং এবং ডুয়ার্সের চায়ের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অথচ দুর্ভাগ্যের কথা, চা উৎপাদনের সঙ্গে যারা সরাসরি জড়িত, সেই শ্রমিক-কর্মচারীরা আজ চরম অবহেলিত এবং বঞ্চিত। স্বাধীনতার এত বছর পরে চা শ্রমিকরা এখনও অনাহারে এবং অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। বন্ধ চা-বাগানে অনাহারে মৃত্যুর তালিকা ক্রমে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। ডানকান গ্রুপের চা-বাগানগুলিও আজ একই দৃশ্যের মুখোমুখি। চা-বাগানের এই অবর্ণনীয় অবস্থার কথা মানুষের কাছে সুবিদিত। তবুও কেন্দ্র-রাজ্যের উদাসীনতা ঠেকানো আজও সম্ভব হয়নি। হইহই করে এই নিয়ে রব উঠলেই সরকারি সক্রিয়তা সাময়িক চোখে পড়ে। সমস্যার গভীরে না গিয়ে সমাধানের সরকারি টোটকা নজরে আসে। সস্তার জনপ্রিয়তা কুড়াতে বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের মাসিক নামমাত্র সরকারি ভাতা, ২ টাকা কেজি চাল, ৩ টাকা কেজি গম দেওয়া হয়, যা সাময়িক ব্যথা

সারা বিশ্বে দার্জিলিং এবং ডুয়ার্সের চায়ের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অথচ দুর্ভাগ্যের কথা, চা উৎপাদনের সঙ্গে যারা সরাসরি জড়িত, সেই শ্রমিক-কর্মচারীরা আজ চরম অবহেলিত এবং বঞ্চিত। স্বাধীনতার এত বছর পরে চা শ্রমিকরা এখনও অনাহারে এবং অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। বন্ধ চা-বাগানে অনাহারে মৃত্যুর তালিকা ক্রমে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

উপশমের টোটকা হলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে উপযোগী হতে পারে না। সমস্যার সমাধানে আরও গভীরে যাওয়া দরকার, যা আদৌ করা হচ্ছে না।

সময়োচিতভাবে চা শ্রমিকদের মজুরি চুক্তি না করাই মালিকপক্ষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। শ্রম দপ্তর মজুরি চুক্তির জন্য ত্রিপাক্ষিক বৈঠক আহ্বান করলেও কোনও সমাধানসূত্র বার হয়ে আসে না। ২০১৪ সালের ৩১ মার্চ পুরনো চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। ২০০১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি মজুরি চুক্তিতে তিন বছরে ১১ টাকা ১০ পয়সা মজুরি বেড়েছিল। ৩৪ টাকা ৮০ পয়সা থেকে ৪৫ টাকা ৯০ পয়সা মজুরি হয়। তিন বছরের ব্যবধানে মজুরি বেড়েছিল ৮ টাকা। ২০০৫ সালের ২৫ জুলাই স্বাক্ষরিত চুক্তিতে ৪৫ টাকা ৯০ পয়সা থেকে মজুরি হয়েছিল ৫৩ টাকা। ২০০৮ সালের ১৩ অগাস্ট চুক্তিতে ১০ টাকা মজুরি বাড়ে। ৬৩ টাকা ৯০ পয়সা থেকে ৬৭ টাকা মজুরি হয়। ২০১১ সালে পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতাসীন হয়। ৬৭ টাকা থেকে তিন বছরের ব্যবধানে চা শ্রমিকদের মজুরি ৯৫ টাকা হয়। তাই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যমান অনুযায়ী চা শ্রমিকরা কী পান— মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তা একটু বুঝে ওঠা দরকার। চা-বণিকসভা থেকে বলা হচ্ছে, ২০০১ সালে ৩১.৮৫ শতাংশ, ২০০৫ সালে ১৭.৪ শতাংশ, ২০০৮-এ ১৪.৩০ শতাংশ এবং ২০১১ সালে ৪১.৮০ শতাংশ চা শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে। অথচ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বেড়েছে কয়েক গুণ। তাই দ্রব্যের মূল্যমানের নিরিখেই চা শ্রমিকদের মজুরি চুক্তি হওয়া প্রয়োজন।

(ক্রমশ)

বনপথের পাঁচালি

অমলকান্তি যে সময় মাদারিহাটের হর্তাকর্তাবিধাতা, আমি তখন উমাচরণপুরে জলদাপাড়া জঙ্গল ঘেঁষা হলং নদীর কোলে বিশু মহারাজের অরণ্য কুটিরে নিশ্চিন্তে, নির্ভাবনায় দিনযাপন করছি। মেচ, রাভা, সাঁওতাল পল্লিতে আপন খেয়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ করে টুনটুনি পাখির শব্দ— 'আমি অমল বলছি। আজ দোলপূর্ণিমা। রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর জলদাপাড়া জঙ্গলে ঘুরব আপনাকে নিয়ে। রেডি থাকবেন।' উত্তম প্রস্তাব। শুনে বিশু বলে, 'আমাকেও সঙ্গে নেবেন। জ্যোৎস্নায় বনরোমাঞ্চ দেখার ইচ্ছা অনেক দিনের।' সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ মেচিয়াদের নাচ-গান শুনি। শালকুমারের মাস্টারমশাই সুবল কার্জি, অনিকেত বসুমাতারি, জলদাপাড়া সাহিত্য পত্রিকার সুশীতল, আরও অনেকের উপস্থিতিতে জ্যোৎস্না মাখা রাত মধুময় হয়ে ওঠে। মেচ ভাষায় একটি মেয়ে চমৎকার রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনাল। নাচ-গান শেষ হলে আরণ্যক নিস্তব্ধতা ফিরে এল। অরণ্য কুটিরের ম্যানেজার বাচ্চু বলে, জেঠু, জলদাপাড়ার গন্ডাররা বড় ভাল। প্রতিদিনই তো টুরিস্টদের মুখোমুখি হচ্ছে। ভয় বেশি মাথামোটা বাইসনদের নিয়ে। মানুষ দেখলেই তেড়েফুঁড়ে আসে। আমাকে একবার তাড়া করলে গাছে উঠে পড়ি সাইকেল ফেলে। যথাসময় অমলকান্তি গাড়ি নিয়ে চলে আসে। সঙ্গে বন্দুকধারী ফরেস্ট গার্ড। শালকুমার দিয়ে প্রবেশ। গুনগুনিয়ে বিশু গাইছে, 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে/ বসন্তের এই মাতাল সমীরণে'।

ফিনকি দিয়ে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ছে। দু'পাশে সারি সারি বৃক্ষরাজি জ্যোৎস্নায় ধূসর, বড় আধিভৌতিক। ভয়ংকর নৈঃশব্দ্যের সুরমূর্ছনা। সব কিছু ছাপিয়ে উঠছে ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ আকুল ক্রন্দন। অরণ্যের এক মোহময়ী রূপ যে না উপলব্ধি করেছে, তাকে কীভাবে বোঝাব এর অনাবিল আনন্দ? চরাচর সাদা জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত। অনেককাল পর এমন সুন্দর জ্যোৎস্নার অনির্বচনীয় রূপ তনু-মনকে শিহরিত করে তুলল। কারও মুখে কথা নেই। অরণ্যের আঁকাবাঁকা পথে, লম্বা লম্বা নলখাগড়া (এলিফ্যান্ট গ্রাস), মালসা, চেপ্টি, ঢাড্ডা ঘাসের উন্মুক্ত তৃণভূমি দিয়ে হরিণডাঙা ওয়াচটাওয়ারের কাছে পৌঁছাতেই চক্ষু ছানাবড়া। দেখি কয়েক হাত দূরে গন্ডার রানি নাদুসনুদুস শরীর নিয়ে বাচ্চাসহ ড্যাবডেবে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে। সত্যি দুর্লভ দৃশ্য। অন্তত আমার জীবনে প্রথম। চারদিকে পিন ড্রপ সাইলেন্স। গাড়ির হেডলাইট

নেবানো। জ্যোৎস্না চুঁইয়ে পড়ছে গন্ডারের শরীর বেয়ে। বিশু আস্তে আস্তে গাইছে, 'কেন চেয়ে আছ গো মা, মুখপানে'। আমরা প্রাণভরে দেখছি। হঠাৎ বনভূমি কাঁপিয়ে সশব্দে বনপথের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল। নজরমিনার থেকে রাতপাহারাদার নেমে আসে।

—সব ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ স্যার।

—আদা দিয়ে একটু লাল চা বানাও।

বিশু বলে, 'এখনও আমার ঘোর কাটেনি গৌরীদা।' চায়ে চুমুক দিয়ে আবার দে ছুট। হেডলাইট বন্ধ। জ্যোৎস্নালোকে গাড়ি চলছে ঢিমে তালে শিলতোর্সা ওয়াচটাওয়ারের দিকে। কিছুটা যেতেই ব্যারিকেড। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ। আমরা সবাই স্ট্যাচু। স্পিকটি নট।

দাবিদাওয়া কিছুই নয়। বনপথের উপরে ডাইনে-বাঁয়ে তৃণপ্রান্তরে বাইসনদের মহামিছিল। পায়ে সাদা মোজা। জ্বলজ্বল করছে চোখ। জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী। ধন্যবাদ অমলকান্তি, তুমি না নিয়ে এলে এমন দুর্লভ দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হতাম। চরকিপাক কেটে রাত্রি বারোটার পর ফিরে আসি বিশুর সাধনকুঞ্জে। ঘরে ঢুকে বিছানায় লম্বা হই। খোলা জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না লুটিয়ে পড়েছে। ক্ষণে ক্ষণে তক্ষকের ডাক। অবিরাম ডেকে চলেছে পিউ কহাঁ। পিউ কহাঁ। কখনও চোখ গেল! চোখ গেল!

একটু দেরি করেই শয্যা ত্যাগ করি। বারান্দায় বসে চা পান করতে করতে পাখিদের কলকাকলি শুনি। ঝাঁকে ঝাঁকে বুলবুলি, আনাচকানাচে টিংটিং করে দোয়েল ঘুরছে-ফিরছে। ডুমুর গাছে ইষ্টিকুটুম থেকে থেকে ডাকছে।

—সুপ্রভাত বিশু।

—গৌরীদা, এই দেখুন মশারি। পুকুরে নেমে মাছ ধরব।

পরিশ্রম জবর হল, তুলনায় মাছ উঠল কম। বটকেষ্টদার প্রশ্ন— 'সকালে কী খাবেন?'

—যা খাওয়াবে তা-ই খাব। বাড়িতে থাকলে ছাতুর শরবত, না হলে দই-চিঁড়ে।

—আহা, তা হবে কেন! আলুর পরোটা হচ্ছে। গেস্টরাও তা-ই খাবে।

প্রাতরাশ সেরে বনপথে ঘুরে বেড়াই। দু'ধারে রাশি রাশি ভাঁটফুল, দণ্ডকলস, থানকুনি, বন্য ফার্ন গাছ, ঢেঁকি শাক, শতমূলি, বন্য টগর, শিমুলের তুলো উড়ছে। মহাস্থবির বটবৃক্ষ, ঘোড়ানিম, বনকাঁঠাল, পিঠালি, আমলকী— কত যে গাছের সমারোহ। হলং নদীর পাশে চুপটি করে বসে থাকি।

ভাবছিলাম, সঙ্গে আনা 'রাসকিন বন্ড', না হলে করবেট মহাশয়ের লেখা

'জাঙ্গললোর' পড়ব। হঠাৎ বিশু এসে বলল, 'গৌরীদা, পুঁথিপুস্তক, লেখালেখি রাখুন। চলুন যাই শিসামারায় গন্ডারের বাড়ি দেখে আসি। যাব, দেখে-শুনে চলে আসব। ফালাকাটার পাঞ্চজন্য থেকে গাড়ি আসছে।'

—তবে তা-ই হোক।

বাচ্চুর বাবা দয়ালহরির প্রশ্ন— 'আবার কই চললেন?

—শিসামারা। রাইনো কটেজ।

উমাচরণপুর থেকে ফালাকাটা হয়ে শালকুমার। অনেক বছর শালকুমার, রাইচেঙ্গা গ্রামে ছিলাম বড় আনন্দে। গ্রামের পথটি ভীষণ সুন্দর। দু'পাশে হলুদ ফুলে ছাওয়া করলাখেত, মিষ্টি কুমড়ো, বেগুনের খেত। গাড়ি থামিয়ে বিশু বিশাল ফুটবলের আকৃতির মিষ্টি কুমড়ো কেনে। মিষ্টি কুমড়োর পাট ভাজা বেসন দিয়ে সেদ্ধ, ছক্কা খাওয়াব গেস্টদের। শালকুমারের অনেক পরিবর্তন। বিশু বলে, 'গৌরীদা, জসীমউদ্দীনের পদ্যটি মনে পড়ে? —রাখাল ছেলে বারেক ফিরে চাও/ বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও?'

নতুনপাড়া ছুঁয়ে বাঁশঝাড় চাষিভাইদের ঘরবাড়ির মাঝখান দিয়ে পৌঁছে গেলাম রাইনো কটেজ। অরণ্যের মধ্যিখানে দু'খানা ঘর নিয়ে প্রায় তেতলা সমান লোহার সিঁড়ি বেয়ে উঠলে মনে হবে, স্বর্গপুরীতে চলে এলেন। সম্মুখে বাঁধ, শিসামারা নদী, জলদাপাড়া জঙ্গল। পর্যটকরা বিছানায় শুয়ে-বসে-গড়িয়ে গন্ডার, হাতি, বাইসনদের দেখেন। গন্ডারদের প্রিয় জায়গা। নদীর জলে

স্নান, গড়াগড়ি, ঝগড়া, বিশ্রাম— সবই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। অনবদ্য লোকেশন, নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। অনেকে শিসামারার নামও শোনেননি। আগামী দিনে শিসামারা জনপ্রিয় বিখ্যাত হবে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে। তখন রিসর্টের জঙ্গলে পরিণত হবে। শোনা যাচ্ছে, অনেকে জমি কিনে রাখছেন। আমরা ঘণ্টাখানেক কাটাই। চা খাই। স্থানীয় এক ছোকরা পর্যটক কেউ এলে চলে আসে। রেঁধে-বেড়ে খাওয়ায়, সেবাযত্ন করে। আমাদেরকে বলে, ‘আপনারাও দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে যান।’ বিশু হাসে— ‘গৌরীদা, মাছগুলো নিয়ে এলে ভাল হত। তুমি বাপু আমাদের একটু ভাল করে চা-টা খাওয়াও।’ রাইনো কটেজ বুকিং— অলোক গুহ ৯৪৩৪৬০৭৮২৫।

উমাচরণপুরে ক’দিন কাটিয়ে একদিন ভোরে চা খেয়ে বাচ্চুর গাড়িতে মাদারিহাট। বিশুর বারংবার অনুরোধ— ‘থেকে যান। আবার কোথায় যাবেন?’

—আর বেঁধো না মায়াডোরে। আমি নিত্য চলার পথিক। পথিক জনের লহ নমস্কার। মাদারিহাট থেকে সটান রাজাভাতখাওয়া। প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে আসতেই মামন ট্রেকারস’ হাটের পরিমলের মুখোমুখি। —‘কাকু, থাকবেন তো একটা দিন আমাদের আস্তানায়?’

—না ভাই, সন্ধ্যার আগে ফিরতে হবে আলিপুরদুয়ারে।

বক্সা বাঘবনের চেকপোস্টে পরিমলের অতি মামুলি চা-দোকান। এবারে দেখলাম, মাটির মেঝে পাকা হয়েছে, তবে হাই বেঞ্চ-লো বেঞ্চ যেমন ছিল, তেমনই আছে। পিছনে বয়ে চলেছে চৈতন্যঝোরা। চারপাশে জঙ্গল। দোকানে ঢুকতেই শিবুনের সঙ্গে দেখা। পাখি, প্রজাপতি, বনজঙ্গল নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত। —‘চলেন গৌরীদা, নতুন পথে আপনাকে নিয়ে যাই নিমাতি।’ পরিমলের চা-দোকান ভ্রমণপিপাসু, ভ্রামণিকদের ঠেক। ওর কাচের শোকেসে বিস্কুট, চানাচুর, চিঁড়ে-মুড়ির সঙ্গে অনেকের লেখা ভ্রমণবৃত্তান্ত দেখতে পাবেন। সাদাসিধে ভোলাভালা প্রকৃতির ছেলে। ঘুগনি-পাউরুটি আর চা খেয়ে শিবুনের পঙ্খিরাজে চেপে বসি।

রাজাভাতখাওয়া লেবেল ক্রসিং টপকে ওপারে চলে আসি বাঁ দিকে তারা থাপার গ্রাসি লিপস। ডান দিকে শতাব্দীপ্রাচীন কড়ি গাছের জটলা, শান্ত নির্জন পথে একটুখানি গেলেই বনবাংলো। বহু বছর আগে টাইগার লজে কাঠের দোতলায় দিনকয়েক ছিলাম। ডান দিকে ডিমা ফরেস্ট বিট। ঘন জঙ্গল, গা ছমছমে পরিবেশ এখন রূপকথার গল্প। তবু কাঠ চোরদের হাত থেকে এখনও পর্যন্ত কিছুটা হলেও রক্ষা করা গিয়েছে। সম্মুখে ডিমা নদী। উপরে সেতু। নীল-সাদাতে মেশা। মনে পড়ে, কোনও এক স্বর্ণালি সন্ধ্যায় টাটুর গাড়িতে চেপে বেড়াতে এসেছিলাম। সেতু তখন সমাপ্ত, উদ্‌বোধনের অপেক্ষায়। বাঁ দিকে ভুটান পাহাড়, অরণ্য, চা-বাগান, অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্য। ডিমা, কালচিনি, চিঞ্চুলা, গাঙ্গুটিয়া। পৌঁছে গেলাম আটিয়াবাড়ি চা-বাগানে। পথের দু’পাশে দু’টি পাতা, একটি কুঁড়ি তোলার ছন্দোময় দৃশ্য দেখার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ি। সবুজ শামিয়ানার নিচে মেয়ে-বউরা লাইন দিয়ে যাচ্ছে কাঁচা পাতার পোঁটলা নিয়ে। চৈতালি হাওয়ায় ঝরে পড়ছে শুকনো পাতা। তুষারপাতের মতো শিমুল তুলো বাতাসে উড়ে পড়ছে চারদিকে। শতবর্ষেরও বেশি পুরনো চা-বাগান। কাঠের লজ্‌ঝড়ে বাংলো অনাদরে পড়ে আছে। অদূরে ফ্যাক্টরি, চায়ের গন্ধ নাকে লাগছে। শ্রমিকদের ঘরবাড়ি, সুখা নদী পার করে মন্দির, বাবুদের কোয়ার্টার। সম্মুখে সুবিস্তৃত নদী। চা-বাগানের নির্জন পথে কালভার্টের উপর চুপচাপ বসে বিশ্রাম নিই। শিবুন পাখির সন্ধানে ব্যস্ত। —‘ওই দেখুন শ্রাইক, পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ খায়।’ শান্ত স্বরে ডাকছে দূরে ঘুঘু পাখিটি। মাঝে মাঝে বসন্তবৌরির ডাকে মুখর। সারাক্ষণ ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ। চা-বাগানের নির্জন পথে যেতে যেতে মনে হয়, এই পথ যদি না শেষ হয়...

চা-বাগানের সীমানা শেষ হতেই শুরু হল নিমাতির জঙ্গল। কিছু শাল, শিশু, সেগুন, শিরীষ, গামহার গাছ। কত-শতবার এখানে এসেছি। বেশির ভাগ হয় কালচিনি, না হলে হাই রোড-নিমতি দোমোহনি হয়ে। আটিয়াবাড়ি হয়ে এই প্রথম। অতীতের স্মৃতিচিত্রণে এখনকার কিছুই মেলে না। পুরনো হেরিটেজ কাঠের বাংলো নেই। মনে পড়ে বর্ষামুখর নির্জন বনবাংলো। সঙ্গী শুধু চৌকিদার। লম্ফের আলোয় পড়ছি ভিজিটরস’ নোটবুকের পাতা। বনকর্তাদের অগ্রাধিকার। আগমন, নামমাত্র দক্ষিণা— থাক সেসব কথা। পুরনো আদলে নতুন বনবাংলো। লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। বাংলোর আঙিনায় গোরু-ছাগল চরছে। উলটো দিকে বন দপ্তরের কোয়ার্টার, অফিস, স্তূপীকৃত লাঠা। কিছুটা সময় কাটাই। লোকজনের দেখা মিলল না, তাহলে বনবাংলোর ভিতরটা দেখা যেত। নিমাতি থেকে সোজা নিমতি দোমোহনি। সোজা পথ চলে গিয়েছে নিমতিঝোরা চা-বাগান, ইষ্টিকুটুম, পাটকাপাড়া চা-বাগান, গাছবাড়ি। মোড়ের মাথায় চা-দোকানে বসে গরম শিঙাড়া আর চা খাই। তারপর রয়ে-সয়ে হাই রোড ধরে বাইরাগুড়ি, মাঝেরডাবরি চা-বাগান হয়ে আলিপুরদুয়ার।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

সুস্বাস্থ্যের ডুয়ার্স

আজও গরিবের বিশ্বাস-ভরসা নিশিগঞ্জের মুশুর বৈদ্যের হাসপাতাল

কোচবিহারের রাজপরিবারের রাজবৈদ্য ছিলেন মুশুর ইশোর। সবাই মুশুর বৈদ্য বলেই চেনে। গাছপালার শিকড়, ছাল, পাতা ইত্যাদি, নানানরকম ধাতু, পাথর, বিভিন্ন পদার্থের ভস্ম প্রভৃতি থেকে তৈরি করতেন তাঁর চিকিৎসার ওষুধপত্র তৈরির উপাদান। কোচবিহার শহর লাগোয়া নিশিগঞ্জ ছিল এই রাজবৈদ্যের বাসভূমি। সেখানে আজও বংশপরম্পরায় চলেছে তাঁরই শেখানো পদ্ধতিতে চিকিৎসার প্রথা। কথা হচ্ছিল বেবি ইশোরের সঙ্গে। তিনি এই বংশে মুশুর কবিরাজের পুত্রবধূ। বললেন, তাঁর শ্বশুরমশাই মারা গিয়েছেন প্রায় পঞ্চাশ বছর হল। শ্বশুরমশাইয়ের বাবা ছিলেন প্রকৃত রাজবৈদ্য। তিনিই নাকি আসল মুশুর কবিরাজ। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াল, বাবা-ছেলে দু’জনেই মুশুর কবিরাজ হিসেবে খ্যাত। বেবি ইশোরের স্বামীরা তিন ভাই— রাজমোহন ইশোর, কালীমোহন ইশোর,

বিষ্ণুমোহন ইশোর। এখন এই ইশোর বংশ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। তবে নিশিগঞ্জের এই কবিরাজি চিকিৎসার ধারা রেখেছেন দু'-তিনজন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন এই বেবি ইশোর, যিনি স্বামীর মৃত্যুর পর জোরালো হাতে হাল ধরেছেন এই পরম্পরার। নিজের গরজে তৈরি করেছেন একটি চিকিৎসালয়। তাতে গড়পড়তায় কুড়ি-পঁচিশজন রুগি থাকেনই। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন সমস্ত ঘরগু। কথা বললাম রোগীদের সঙ্গে। তাজ্জব হয়ে গিয়েছি নিজের চোখে দেখে, শুনে। সম্পূর্ণ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই মানুষরা আসেন এখানে। মূলত হাড় ভাঙার চিকিৎসাটাই এখানে হয় গুরুত্বের সঙ্গে। বাকি কেউ অন্যান্য রোগ নিয়ে এলেও সব কিছুর দায়িত্ব এঁরা নেন না, যদি না সে ব্যাপারে চিকিৎসার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত আস্থার দৃঢ়তা থাকে। কিন্তু হাড় ভাঙা রুগির ক্ষেত্রে জানা গেল, 'হাড় ভাঙলে আমরা কখনওই ফেরাই না, সে যে ধরনের হাড় ভাঙাই হোক, যত জটিলই হোক।' দেখলামও তা-ই। তিনতলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল ছেলেটি। শিরদাঁড়ার হাড়গুলো চুরমার। ফলে পুরো শরীর প্যারালাইজড। বাংলাদেশ থেকে খোঁজখবর নিয়ে এসে হাজির হয়েছে এই নিশিগঞ্জের চিকিৎসালয়ে। একটি ঘর ভাড়া করে ওর পরিবারের লোক ওর সঙ্গে আছে এখানে প্রায় বছরখানেক হল। এখন সে ঘাড় তুলতে পারে, পা নাড়াতে পারে। তবে একটা পায়ের হাঁটুতে জোর কম। হাত দুটো পুরোপুরি সচল। ছেলেটির বাড়ির লোকেরাও অত্যন্ত খুশি এখানকার চিকিৎসায়। বাইক দুর্ঘটনার প্রচুর কেস আসে এখানে। বিভিন্ন হাসপাতাল, নার্সিং হোম ঘুরে তারপর আসে— এমনও হয়। কিন্তু দেরি করে আসার জন্য সমস্যা হয় বেশি। যাঁরা ঘটনা ঘটার পরপরই চলে আসতে পারেন, তাঁরা উপকার পান বেশি। হাসপাতালটির ঘরগুলিতে এক-একটি পরিবার ছোট্ট করে সংসারের যাবতীয় জিনিস নিয়ে মাসের পর মাস থেকে চিকিৎসা করান। আলাদা আলাদা ঘর ছাড়াও রয়েছে ডর্মিটারির ব্যবস্থা। সেখানে বড় ঘরে পাঁচ-ছ'জন রুগি পরিবারসহ থাকতে পারেন। কলকাতায় পড়ে গিয়ে কোমর ভেঙে গিয়েছে এমন রুগিকে দেখা গেল, ৪৫ দিনের মাথায় ওয়াকার নিয়ে হাঁটতে পারছেন।

চিকিৎসাপদ্ধতিটিতে প্রাধান্য পায় তাঁদের নিজস্ব ফর্মুলায় তৈরি করা ওষুধ। এই ওষুধ তৈরি করতে হলে কয়েকশো রকমের পদার্থ লাগে, তার কিছু নমুনা এরকম— গুলঞ্চ লতা, কর্ণমূল, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, লাল চন্দন, নিম গাছের ছাল, শিমুল মূল,

লাক্ষা, হিং, জায়ফল, হরীতকী, বহেড়া, নাগেশ্বর ফুল, লবঙ্গ, দারচিনি— এরকম প্রচুর ধরনের গাছপালার বিভিন্ন অংশ। রয়েছে অভ্র, সোনা ভস্ম, রুপো, তামা, সোহাগা, প্রবাল, পারদ, লোহা ইত্যাদি। কোথা থেকে এতসব সংগ্রহ করেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমাদের নিজস্ব লোক আছে, তারাই সংগ্রহ করে। কিন্তু ফরেস্টে আজকাল কিছুটা অসুবিধা হয়, কারণ আমাদের এই কাজের জন্য বন দপ্তরের কোনও সহযোগিতা নেই। দেখি এভাবে কদ্দিন চালাতে পারি।' বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা এই সমস্ত জিনিসকে কাজে লাগিয়ে একুশরকম ওষুধ তৈরি করেন বেবি ইশোর নিজেই। এই শিক্ষা তিনি পেয়েছেন তাঁর স্বামীর কাছ থেকে। ওষুধের নামগুলি এরকম— গজাঙ্কুশ, শূলবজ্রবটী, চতুর্মুখী, গৃহিণী গজেন্দ্রবটী, মেহচন্দ্রপ্রভা, মহেশ্বর রস, কাশলক্ষ্মী বিলাস, চিন্তামণি, রসায়ন, চন্দ্রপ্রভা, মহাবাদগজাঙ্কুশ ইত্যাদি। এসব ওষুধ প্রয়োগ করে তারপর কাশলক্ষ্মী বিলাস, চিন্তামণি, রসায়ন চন্দ্রপ্রভা, মহাবাদগজাঙ্কুশ ইত্যাদি ওষুধ প্রয়োগ করে তারপর প্রয়োজনমতো সেলাই করা হয়, ট্র্যাকশনে রাখা হয়। স্যালাইন এবং রক্ত দেওয়ার বন্দোবস্তও আছে। সেসব বিষয়ে যাঁরা দক্ষ, তাঁদের ডাকা হয় সংলগ্ন বড় শহর কোচবিহার থেকে।

রোগী আসছেন নানান জায়গা থেকে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়িসহ তরাই-ডুয়ার্সের বিভিন্ন জেলার ছোট-বড় শহর-গ্রাম থেকে তো বটেই, আসেন আসাম, বিহার প্রভৃতি প্রতিবেশী রাজ্য থেকেও। প্রতিবেশী দেশ কোচবিহারের গা ঘেঁষে থাকায় রুগিরা চলে আসেন বাংলাদেশ থেকেও। আলাপ হল কোচবিহারের মধ্য শহরে বাস করা পঞ্চাশোর্ধ্ব এক মহিলার সঙ্গে। পা ভেঙে পড়ে আছেন বিছানায়। একলাই আছেন, বাড়ির লোকেরা এসে দেখা করে যান, কোনও অসুবিধা নেই। বরং যথেষ্ট খুশি। বললেন, 'সময়টা একটু বেশি লাগে ঠিকই, কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে থাকলে দারুণ ফল পাওয়া যায়। এমন এমন রুগি আছে, যাদের চলতে পারারই কথা নয়, তারাও দিব্যি হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে।'

অভিনব এই হাসপাতাল ঘুরে এবং ভয়ানক রকমের সব হাড় ভাঙা রুগিকে দেখে ও তাঁদের কথা শুনে বুঝলাম, নিশিগঞ্জের এই বংশপরম্পরায় চলে আসা প্রথা কাগজে-কলমে স্বীকৃতি না পেলেও মানুষের বিশ্বাস এবং উপকারের জায়গাটিতে এটির দৃঢ় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে হ্যাঁ, যেহেতু গ্রাম্য পরিবেশে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক কম অর্থ ব্যয় করে এই হাসপাতালটি তৈরি করা, তাই কিছুটা হলেও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যেই কষ্ট করে থাকেন রুগির পরিবারের মানুষ। তবুও থাকেন। হয়ত বা উপকার পাওয়ার মাত্রা এসব কিছুকে ছাপিয়ে যায় বলেই।

শ্বেতা সরখেল

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে WBCS-২০১৭-এর বিজ্ঞপ্তি

রাজ্যের স্কুলগুলির জন্যে ক্লার্ক ও গ্রুপ-ডি পদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। শূন্যপদ প্রায় ৫,০০০। আইবিপিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়েছে, শূন্যপদ প্রায় ২০,০০০। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ক্লাক ও গ্রুপ-ডি পদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে শীঘ্রই। শূন্যপদ প্রায় ৬০,০০০। শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে ডব্লিউবিসিএস-২০১৭-এর বিজ্ঞপ্তি। এ সকল চাকরিগুলির মধ্যে মর্যাদায় এবং কৌলিন্যে শীর্ষস্থান দখল করে রয়েছে ডব্লিউবিসিএস। এ পরীক্ষাটি যে খুব কঠিন তা নয়।

কোনও ছাত্রছাত্রীদের অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড যতই খারাপ হোক না কেন, তার খেসারত এই পরীক্ষায় দিতে হয় না। কারণ মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক কিংবা গ্র্যাজুয়েশনে প্রাপ্ত নম্বরকে ধর্তব্যই আনে না পাবলিক সার্ভিস কমিশন। পিএসসি নিজের মানদণ্ডে বিচার করে নেয় একজন প্রার্থীকে। ইংরেজি এবং অঙ্কে একেবারে সাদামাটা হয়েও ডব্লিউবিসিএস-এ সাফল্য পাওয়া যায় অনায়াসে। সুতরাং সাধারণ মেধার ছেলেমেয়েদের কাছে ডব্লিউবিসিএস এক আশীর্বাদ স্বরূপ।

WBCS-এর বিষয় বিন্যাস এমন যে, WBCS-এর জন্য প্রস্তুতি নিলে শিক্ষকতা ছাড়া আর সব পরীক্ষাতেই সাফল্য পাওয়া যায়। WBCS-এর জন্য পড়তে হয় ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সংবিধান, অর্থনীতি, ইংরেজি, বাংলা, জিকে, পরিবেশ, জিআই, অঙ্ক, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইত্যাদি। ক্লার্ক, গ্রুপ-ডি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি পরীক্ষার বিষয় হল ইংরেজি, অঙ্ক, জিকে এবং জিআই। সুতরাং WBCS-এর প্রস্তুতি কাজ দেয় আর সকল পরীক্ষাতেই।

কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক

পশ্চিমবঙ্গ স্টাফ সিলেকশন কমিশনের 'কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক' পদের লিখিত পরীক্ষা অগাস্ট-সেপ্টেম্বরে হওয়ার সম্ভাবনা। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে ১৫০ নম্বরের ৯০ মিনিটের লিখিত পরীক্ষা হবে। এর মধ্যে পার্ট-I পরীক্ষায় থাকবে ১২০ নম্বর ও পার্ট-II পরীক্ষায় থাকবে ৩০ নম্বর। পার্ট-I পরীক্ষায় ১২০টি প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের এইসব বিষয়েঃ (১) জেনারেল নলেজ ঃ ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ইতিহাস, ভূগোল, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনা, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, সিভিক্স, স্পোর্টস, আর্ট অ্যান্ড কালচার, অ্যাব্রিভিয়েশন, কম্পিউটার ইত্যাদি— ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। (২) ইংরেজি ঃ ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। (৩) অঙ্ক ও টেস্ট অফ রিজনিং ঃ পাটিগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি, পরিমিতি, টেস্ট অফ রিজনিং— ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। পার্ট-১ পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। দ্বিতীয় পার্টে থাকবে ৩০ নম্বরের ইংরেজিতে প্রেসি লেখা। প্রশ্ন হবে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক মানের। দ্বিতীয় পার্টে ১০ (তপশিলি জাতি হলে ৭ ও তপশিলি উপজাতি হলে (৪) নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। দুই পেপারে পাওয়া নম্বর দেখে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। ইন্টারভিউয়ে থাকবে ১৫ নম্বর।

ব্যাঙ্ক ক্লার্ক

সারা ভারতের ১৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে 'ক্লারিক্যাল ক্যাডার' পদে ১৯,২৪৩ জন ছেলেমেয়ে নেওয়ার জন্য ষষ্ঠ পর্যায়ের কমন রিটেন এগজামিনেশন পরীক্ষার দরখাস্ত নেওয়া শুরু হয়েছে। প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন (প্রিলিমিনারি ও মেন) পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের পার্টে ১০০ নম্বরের ১ ঘণ্টার পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে ঃ (১) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ— ৩০ নম্বর, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড— ৩৫ নম্বর, (৩) রিজনিং এবিলিটি— ৩৫ নম্বর। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। ওই তিনটি বিষয়ের প্রতিটিতে কাট-অফ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। কাট-অফ নম্বর কত থাকবে তা আইবিপিএস ঠিক করবে। কল লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন ২৫ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত। এরপর অনলাইন মেন পরীক্ষা। মেন পরীক্ষা হবে ৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি। এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের। ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে ঃ (১) রিজনিং-৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৩০ মিনিট। (২) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ-৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৩০ মিনিট। (৩) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট-৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৩০ মিনিট। (৪) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (স্পেশাল রেফারেন্স ব্যাঙ্কিং)-৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২৫ মিনিট। (৫) কম্পিউটার নলেজ-২০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২০ মিনিট। প্রশ্ন হবে ইংরেজিতে। মেন পরীক্ষার কল লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন ডিসেম্বরে। প্রিলিমিনারি ও মেন পরীক্ষার নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফল হলে তবেই মেন পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। মেন পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর থকে প্রার্থী নির্বাচিত হবে। কোনও ইন্টারভিউ হবে না। প্রভিশনালি অ্যালটমেন্ট হবে এপ্রিলে।

NITM: Siliguri, West Bengal, Call: 0353-2581582; 94343-27123 (M), web: www.nitm.in

বাঁকুড়ার বন্ধন পোড়ামাটির মন্দিরের চোখ-ভোলানো স্থাপত্য, ধ্রুপদী সংগীতের আবহমান ঐতিহ্য আর কতদিনকার নাম-না-জানা পাহাড়ের সারি - বাঁকুড়ার পরতে পরতে মিশে রয়েছে প্রাচীন বাংলার স্পন্দন। এখানে লাল মাটির রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে কানে ভেসে আসে কুমোরের চাকা ঘোরানোর শব্দ, চোখের সামনে প্রাণ পায় পোড়ামাটির ঘোড়া আর মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি সুর তোলে মনের অন্দরে।

EXPERIENCE Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA
DEPARTMENT OF TOURISM, GOVERNMENT OF WEST BENGAL

www.wbtourism.gov.in/www.wbtdc.gov.in www.facebook.com/tourismwb
www.twitter.com/TourismBengal +91(033) 2243 6440, 2248 8271

Download our app Google play

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি

দেবপ্রসাদ রায়

কেন্দ্র এবং রাজ্য, দুই জায়গাতেই কংগ্রেসের পরাজয়ের শোকে লেখক মাথা ন্যাড়া করে ফেলেছেন। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে উঠেছে প্রবল ইন্দিরা বিরোধী হাওয়া। লেখকের রাজনৈতিক অগ্রজ প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীও কি হয়ে উঠলেন ইন্দিরা বিরোধী? হতাশ লেখক ভাবছেন 'পাল্টা কংগ্রেস' করার কথা। তাই শুনে কী বললেন বরকত গনিখান চৌধুরী? এই কালচক্রে রাজনৈতিক বিধাতার অঙ্গুলি হেলনে গড়ে উঠল কংগ্রেস ইউথ ফোরাম। এবার রাজ্যে তার দায়িত্ব নিয়ে লেখক আবার নামলেন পূর্ণোদ্যমে। কিন্তু আটকানো গেল না কংগ্রেসের 'বিভাজন'। তারপর? ঘটনার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন এবারের পর্ব।

১৮

কংগ্রেসের শাখা সংগঠন একটাই। তা হল যুব কংগ্রেস। জাতীয় স্তরে ছাত্র পরিষদের সেই গুরুত্ব নেই। আর আইএনটিইউসি তো সুযোগ পেলেই বলে যে তারা কংগ্রেস নয়। ইন্দিরাজি তাঁর বিশ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করার পর যেটা অত্যন্ত দরকারি ছিল তা হল, সেই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য যুব কংগ্রেসকে একাত্ম করে নিয়োগ করা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। সঞ্জয় গান্ধির কর্মসূচির উল্লেখ আগে করেছি। সে কর্মসূচি খারাপ ছিল না মোটেই। কিন্তু আজ মনে হয় যে, ওটা ছিল বিশেষ একটা গোষ্ঠীর উদ্যোগ। তারা বিশ দফার রূপায়ণ চাইছিল না বলেই পাঁচ দফার বিকল্প ঘোষণায় মেতে উঠেছিল, এবং সেটা চালু করার জন্য বিন্দুমাত্র উদ্যোগ নেয়নি।

দলেরই একটি অংশ এ কাজের জন্য দায়ী ছিল। পরিণামে ইন্দিরাজি সমস্যায় পড়েন। দল যদি সে সময় ইন্দিরাজির পাশে ঠিকমতো দাঁড়াত, তবে হয়ত জরুরি অবস্থা জারির মতো সিদ্ধান্তও নিতে হত না তাঁকে।

যা-ই হোক। কেন্দ্র এবং রাজ্য— দু'জায়গাতেই কংগ্রেসের ভরাডুবি এবং সেই প্রতিক্রিয়ায় আমার নেড়া হয়ে যাওয়াতেই আবার ফিরে যাই। পরাজিত হতেই কংগ্রেসের একটি অংশ আবার ইন্দিরাজিকে দল থেকে ছেঁটে ফেলার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। '৭৭-এর সেপ্টেম্বরে দলের তালকাটরা স্টেডিয়ামের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হল যে ইন্দিরাজিকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হবে। সে সময়ে রাজ্যে যুব কংগ্রেসের সভাপতি বারিদবরণ দাস। আমাদের মতো কয়েকজন যুব কংগ্রেস কর্মী তখন সঞ্জয় গান্ধির অনুগামী হিসেবে চিহ্নিত। রাজ্যে বারাসত, মুর্শিদাবাদ আর মালদায় সঞ্জয় গান্ধি বিরাট তিনটে জনসভা করতে এসেছিলেন এবং আমরা সেই সভাগুলিতে হাজির ছিলাম। কিন্তু সব মিলিয়ে রাজ্য কংগ্রেসে আমরা কয়েকজন তখন মোটামুটি 'একঘরে'। এসবের মধ্যেই কলকাতায় লাহা বাড়িতে কংগ্রেসের একটা নির্বাচন হয়েছিল, যেখানে আমাদের প্রার্থী আবদুস সাত্তার। 'আমরা' বলতে আমি ছাড়াও সোমেনদা, বীরেনদা, নুরুল ইসলাম। এ ছাড়াও মাথার উপরে প্রণবদা আর গণি খান চৌধুরী।

লাহা বাড়িতে ভোট হল। সেটা আসলে সোমেনদার এলাকা। সোমেনদা আমাদের সঙ্গে থেকে ব্যানার ইত্যাদি বাঁধতে সহযোগিতা করলেন। কিন্তু 'নো ইন্দিরা নো কংগ্রেস' স্লোগান ব্যানারে লিখে আমরা আসরে নামলেও পূরবী মুখার্জি (তিনি একসময় এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রে মন্ত্রীও হয়েছিলেন)-র কাছে আমাদের আবদুস সাত্তার হেরে গেলেন তিরিশ ভোটে। ফলে আমাদের হতাশা আরও বেড়ে গেল। এই অবস্থায় প্রণবদা, বরকতদা, সোমেনদাদের সঙ্গে রাজনৈতিক পর্যালোচনা করে দিন কাটাতে লাগলাম আমরা।

এইরকমই এক হতাশার দিনে আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, 'আমি আমার জেলায় পালটা কংগ্রেস করব। এই কংগ্রেস আমি মানি না।'

বরকতদা বললেন, 'ঠিক বলেছিস!'

এইরকম অবস্থায় ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি যুব কংগ্রেসকে 'ডিসব্যান' করে দিয়ে বললেন যে, সেটা সঞ্জয় গান্ধির পোষা গুন্ডাদের দল। কংগ্রেসের ভাবমূর্তি কলুষিত করছে। তাই এই সিদ্ধান্ত। প্রণবদা তখন সাত নম্বর তালকাটরা রোডে আর বরকতদা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের পাশে গোরাচাঁদ মুখার্জি রোডের একটা ফ্ল্যাটে থাকেন। ওই দু'টি আস্তানা আর সোমেনদার

প্রণবদা শাহ কমিশনে গিয়ে বলেছিলেন, ‘একজন সাংসদ হিসেবে আমি পার্লামেন্টকে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য এবং একজন মন্ত্রী হিসেবে ক্যাবিনেটের কাছে। এর বাইরে তৃতীয় কোনও কিছুর কাছে আমি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই।’ শুনে কমিশনের সদস্যরা স্তম্ভিত। আমরাও ‘প্রণবদা জিন্দাবাদ’ ইত্যাদি আওয়াজ তুলে বেরিয়ে এলাম। সেই প্রথম শাহ কমিশন একটা জোর ধাক্কা খেয়েছিল।

আমহার্স্ট স্ট্রিট— এই ছিল তখন আমাদের গুলতানি করার জায়গা। প্রদেশ কংগ্রেস তখন আমাদের হাতের বাইরে।

সেই অলস দিনগুলিতে একদিন প্রণবদার বার্তা এল। ললিত মাকেন দিল্লিতে পুরনো যুব কংগ্রেসিদের নিয়ে কিছু একটা করার উদ্যোগ নিচ্ছেন। এ বার্তা আসার আগে অবশ্য প্রিয়দা একদিন ডেকেছিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বলে দিয়েছিলেন যে, দল থেকে ইন্দিরাজির বহিষ্কারের ঘটনাকে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন। ‘ক্যানসার ইজ আউট’— এটাও ছিল তাঁর বিবৃতিতে।

প্রিয়দা আমাকে বললেন, ‘যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। তুই আর আমি একসঙ্গে অনেকদিন কাজ করেছি। তুই সঞ্জয় গান্ধির পক্ষ নিয়েছিলি। তা পরিণতি তো দেখলিই। এবার চলে আয়।’

বাধ্য হয়ে সে দিন প্রিয়দাকে বলেছিলাম যে, তাঁকে যখন অপসারিত করা হয়েছিল, তখন আমি যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলাম। প্রিয়দার সেই দুঃসময়ে আমি তাঁর পাশে দাঁড়াতে পারিনি বলে ভিতরে ভিতরে কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু আজ প্রিয়দা সেই একই কাজ করছেন। ইন্দিরাজির দুঃসময়ে তিনি তাঁকে ত্যাগ করতে চাইছেন। এটা দেখে আমার বিবেকের মুক্তি হচ্ছে। তবে সুসময়ে যখন ছিলাম, তখন ইন্দিরাজি আর সঞ্জয় গান্ধির পাশে আমি দুঃসময়েও আছি।

ললিত মাকেনের উদ্যোগের কথা জানিয়ে প্রণবদা বলেছিলেন দিল্লি চলে আসতে। আমি, বীরেনদা আর সোমেনদা তাই রওনা দিলাম রাজধানীর দিকে। বিট্‌ঠলভাই পটেল হাউসে মিটিং ডাকা হয়েছিল। হিমাচল থেকে আনন্দ শর্মা, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে গুলাম নবি আজাদ, হরিয়ানা থেকে চৌধুরী বীরেন্দর সিং, পঞ্জাবের বিনোদ শর্মা, বিহারের তারিক আনোয়ার আর বাংলা থেকে আমরা তিনজন— এই ছিল মোটামুটি উপস্থিতি। সব মিলিয়ে এগারোটা রাজ্যের প্রতিনিধি। সিদ্ধান্ত হল যে আমরা ‘কংগ্রেস ইউথ ফোরাম’ তৈরি করে পুরনো যুব কংগ্রেসটাকে আবার উজ্জীবিত করব। ওড়িশার রামচন্দ্র রথকে প্রায় জোর করেই সেই ফোরামের সভাপতি করলাম আমরা। কারণ, ও তখন এমপি। এর পর চারটে জেনারেল সেক্রেটারির একটা নিতে চাওয়া হল বাংলা থেকে। বীরেনদা চাকরি করতেন, ফলে রাজি হলেন না। সোমেনদাও দেখলাম ভার নিতে চাইছেন না। বাকি থাকলাম চালচুলোহীন আমি।

অতএব কংগ্রেস ইউথ ফোরামের অন্যতম জেনারেল সেক্রেটারি হয়ে গেলাম আমি। সেটা ছিল ’৭৭-এর ৩০ সেপ্টেম্বর।

শাহ কমিশনও গঠিত হয়েছিল প্রায় এই সময়টায়। সে কমিশনে তখন তাবড় তাবড় নেতা যাচ্ছেন আর ইন্দিরাজির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছেন। সিদ্ধার্থবাবু, অম্বিকা সোনি, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়— এক কথায় যাঁরা সব চাইতে বেশি ক্ষমতা ভোগ করেছিলেন, তাঁরাই। একদিন প্রণবদাকেও কমিশনে ডাকা হল। তিনি অর্থমন্ত্রকের ডেপুটি মিনিস্টার ছিলেন। আমরা প্রণবদাকে বললাম যে, আর কেউ ইন্দিরাজির পক্ষে সাক্ষ্য না দিক, উনি দিলেই আমরা ওঁর সমর্থনে তুলকালাম বাধিয়ে দেব— যাতে ওঁর কোনও ক্ষতি না হয়।

প্রণবদা বললেন, ‘আমি ম্যাডামের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেব না।’

প্রণবদা শাহ কমিশনে গিয়ে বলেছিলেন, ‘একজন সাংসদ হিসেবে আমি পার্লামেন্টকে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য এবং একজন মন্ত্রী হিসেবে ক্যাবিনেটের কাছে। এর বাইরে তৃতীয় কোনও কিছুর কাছে আমি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই।’ শুনে কমিশনের সদস্যরা স্তম্ভিত। আমরাও ‘প্রণবদা জিন্দাবাদ’ ইত্যাদি আওয়াজ তুলে বেরিয়ে এলাম। সেই প্রথম শাহ কমিশন একটা জোর ধাক্কা খেয়েছিল। এই ঘটনার পর থেকে প্রণবদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। তালকাটরা রোডে প্রণবদার বাড়ির বাইরের ঘরে রাতে ঘুমাতেও যেতাম মাঝে মাঝে। কিন্তু তখনও অবধি দিল্লিতে স্থায়ীভাবে থাকাটা শুরু হয়নি।

দিল্লিতে কংগ্রেসের তলবি সভা বা রিকুইজিশন মিটিং। যাঁরা ইন্দিরাজির পক্ষে ছিলেন, তাঁদের তলব করা হল। রাজ্যে তখন এআইসিসি-র ছাপ্পান্নজন সদস্য। আমরা সই জোগাড় করতে পেরেছিলাম বোধহয় চব্বিশজনের। একজনের সই নিতে পুরুলিয়ায় চল্লিশ মাইল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মোটর সাইকেল নিয়ে সীতারাম মাহাতোর বাড়িতে হাজির হয়েছিলাম। চালকের নাম ছিল পীতাম্বর। আসলে তখন ইন্দিরাজির পতাকা ধরার লোকের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম।

১ জানুয়ারি ’৭৮। বিট্‌ঠলভাই পটেল হাউসের লনে তলবি সভা বসল। একমাত্র কর্ণাটকের দেবরাজ আর্স ছাড়া প্রথম সারির নেতা বলতে কেউ নেই। মুখ্যমন্ত্রীরা কেউই আসেননি। কেউ কেউ প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন।

সভায় কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। ’৬৯-এর মতোই একটা কংগ্রেস (আই) এবং অপরটি কংগ্রেস (ও)। বলে রাখা ভাল যে, কংগ্রেস (আই) নামটা দিয়েছিল কিন্তু সংবাদপত্রের লোকেরা। তলবি সভায় কেরালার সি এন স্টিফেনও এসেছিলেন। সুবক্তা স্টিফেন সাহেব প্রায়ই বলতেন যে, কংগ্রেস আসলে জন্মলগ্ন থেকেই দুটো সত্তা। একটা পরিকাঠামোর কংগ্রেস এবং একটা আন্দোলনের কংগ্রেস। এই দুই কংগ্রেসে যখনই সংঘাত হয়েছে, প্রতিবারই জিতেছে আন্দোলনের কংগ্রেস। বলাই বাহুল্য যে, কংগ্রেস (আই) ছিল দ্বিতীয়টা। স্টিফেন সাহেব ইতিহাস থেকে ১৯০৭ সালের রাসবিহারী ঘোষ বনাম লাল-বাল-পাল-এর সংঘাত, ১৯৩৯-এ সুভাষ বোস বনাম গান্ধিজির সংঘাত, ১৯৫০-এ নেহরু বনাম পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডনের সংঘাত, ১৯৬৯ সালে ইন্দিরাজি বনাম নিজলিঙ্গাপ্পার সংঘাত প্রভৃতি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।

তিনি যে মোক্ষম বলেছিলেন, তার প্রমাণ কিছু সময় পরেই পাওয়া গিয়েছিল। গোটা কংগ্রেসটাই চলে এসেছিল ইন্দিরাজির পাশে। তিনটি রাজ্যের নির্বাচনে। অন্ধ্রপ্রদেশে ও কর্ণাটকে ইন্দিরাজির কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়ল, আর মহারাষ্ট্রে দুই কংগ্রেসের জোট সরকার গঠিত হল।

যা-ই হোক, কংগ্রেস দু’ভাগ হল আবার। ‘ইউথ ফোরাম’ পরিণত হল ইন্দিরাপন্থী যুব কংগ্রেসে। আমরা যে যা পদে ছিলাম, সেখানেই বহাল থাকলাম। তা এইসব কারণে আমাকে ঘন ঘন দিল্লি যাতায়াত করতে হচ্ছিল। তাই ভাবলাম, সেখানেই পাকাপাকিভাবে থাকতে হবে। থাকার একটা ব্যবস্থাও এবার করে ফেললাম দিল্লি কালীবাড়িতে।

(ক্রমশ)

ক্রীড়া বোর্ড কি কাগজে-কলমেই থেকে যাবে?

গত ৩০ জুন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল আমার মতো উত্তরের অসংখ্য ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ, মাঠ যাঁদের জীবনের সঙ্গে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে গেছে। উত্তরবঙ্গে ক্রীড়াক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তৈরি হতে চলেছে নর্থবেঙ্গল বোর্ড ফর ডেভেলপমেন্ট অফ স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস, যার প্রথম চেয়ারম্যান হচ্ছেন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ তথা গোটা দেশের গর্ব বাইচুং ভুটিয়া। সেই সঙ্গে মান্তু ঘোষ, ঋদ্ধিমান সাহা, শিবশংকর পাল, এঁদের মতো খেলোয়াড়দেরকেও রাখা হয়েছে এই বোর্ডে। এইসব বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের দক্ষতা ও জনপ্রিয়তা উত্তরের খেলোয়াড়দের উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করার পক্ষে যথেষ্ট। অন্যদিকে, অর্থের সমাগম বহু সুযোগ সন্ধানীর ভীড় ঘটালেও এঁদের উপস্থিতি ও ব্যক্তিত্ব সেসব হঠিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

বলাই বাহুল্য, মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম এইবার পিছিয়ে পড়া উত্তরবঙ্গে খেলাধুলার মানোন্নয়ন আর কোনও সমস্যা হবে না। খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করা, খেলার মাঠের সংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, নতুন খেলোয়াড়দের উঁচু মানের প্রশিক্ষণ, দুঃস্থ প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের জন্য আর্থিক সহযোগিতা এ সবেরই সমাধান হতে পারে এই বোর্ড গঠনের ফলে। মহকুমা বা ব্লক স্তরে খেলাধূলোকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারে এই বোর্ড। বেকারি ও সর্বনাশা নেশায় ভুগছে আজকের ডুয়ার্স-তরাইয়ের কিশোর-তরুণ সমাজ। তাদের সামনে অসৎ পন্থায় অর্থ সংস্থান ছাড়া অন্য কোনও পথ দেখাতে পারেনি এখানকার রাজনৈতিক নেতারা। খেলাধুলায় উৎসাহ প্রদান এবং অর্থ সংস্থান এই তরুণ সমাজকে সুস্থ পথে ফিরিয়ে আনতে পারে। অথচ মাস দুয়েক হয়ে গেল বোর্ড নিয়ে আর কোনওরকম অগ্রগতির খবর আমরা পাচ্ছি না। স্বভাবতই ফের শঙ্কিত হয়ে উঠেছি, তবে কি সবটাই নিছক কাগজে-কলমে?

সুশান্ত ঘোষ, সুকান্ত পল্লি, শিলিগুড়ি

বালুরঘাটের সুইমিং পুল

আমরা বালুরঘাটের বেশ কিছু প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এবং একটি বড় অংশের ছোট স্কুল পড়ুয়ারা বালুরঘাট মিউনিসিপ্যালিটির সুইমিং পুলের নিয়মিত সদস্য। দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ আমি ব্যক্তিগতভাবে সাঁতার করছি। এক বছরে প্রায় ৮ মাস পুল খোলা থাকে। এই সময়কালে মাত্র তিন বার জল বদলানো হয়। নিয়মিত জল না বদলানোর ফলে সাঁতারুদের বিভিন্ন ধরনের ত্বক সংক্রমণ ঘটে থাকে। প্রতিদিনই কিছু পরিমাণ ফ্রেশ জল দেবার ব্যবস্থা থাকলে জলের গুণগত মান বজায় থাকে এবং চামড়ায় সংক্রমণের সমস্যা অনেক কমে যায়।পাশাপাশিভাবে গোটা সিজনে সাকুল্যে তিন বার জল পুরনো পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয়। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার। প্রচুর জল অযথা নষ্ট হয়। এক্ষেত্রে যদি জলকে রিসাইকেল করে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করা যায় তবে প্রচুর জলের সাশ্রয় হবে। বিষয়টি পুর কর্তৃপক্ষকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার জন্য আর্জি রাখছি।

অলিন্দ চক্রবর্তী, বালুরঘাট

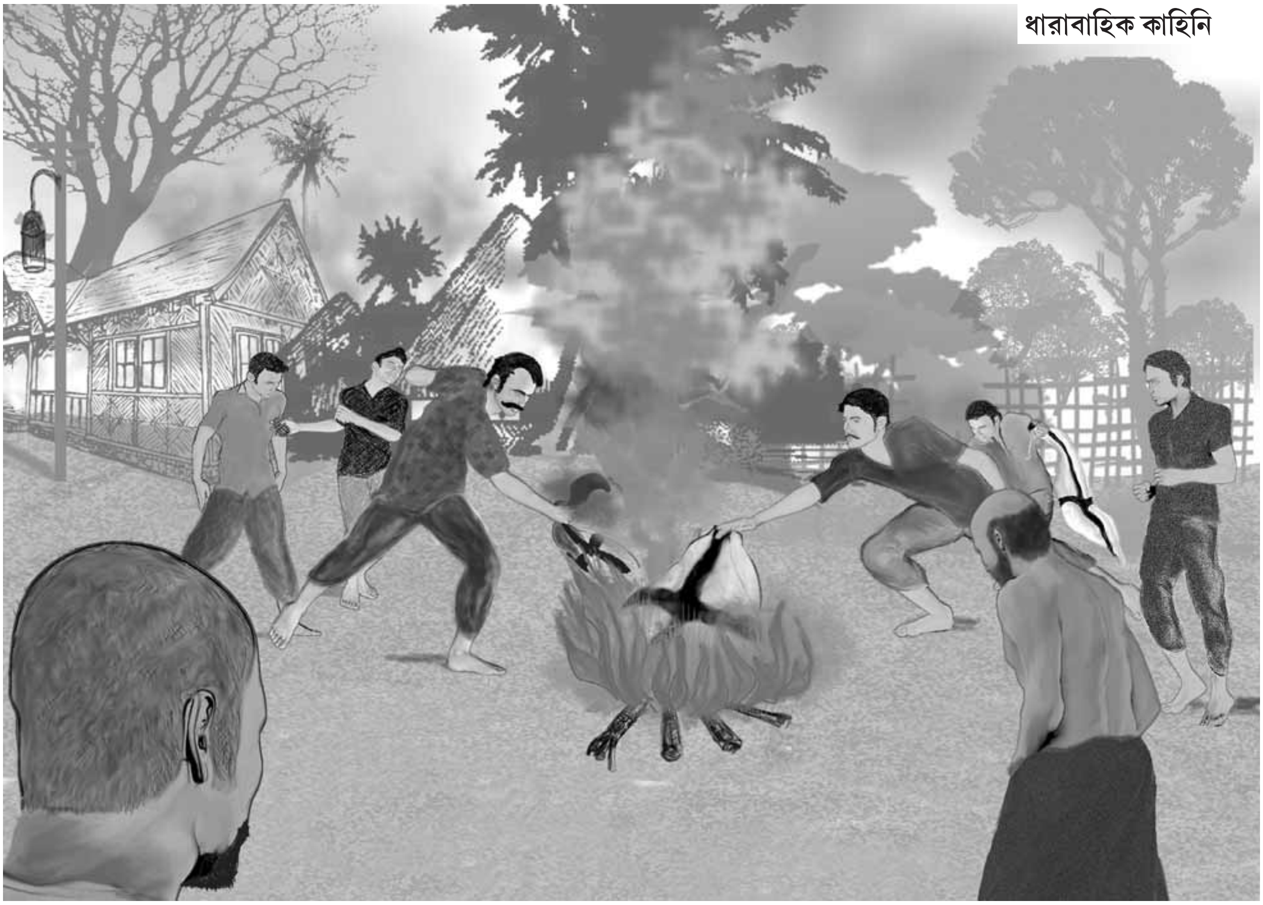

তরাই উৎরাই

ভবেন বাঁড়ুজ্জে চায়ের দোকানটা দিয়েছেন খাসা। স্যানিটারি টাইলস বসানো বারান্দা। ঘরের মেঝে লাল পাথরে বাঁধানো। সেখানে কাঠের টেবিল আর লোহার শিকের চেয়ার। দেয়াল অর্ধেক লাল ইটের, বাকিটা ডাব ওয়াল। টিনের চালের নিচে কাঠের সিলিং। চায়ের দাম চার পয়সা থেকে দু'আনা। সঙ্গে মাখন লাগানো টোস্ট একজোড়া এক আনা। কলকাতা থেকে আনা হয়েছে ফার্পের কেক আর বিস্কুট। ভবেনবাবুর পোশাক-পরিচ্ছদ পাক্কা সাহেবি। চিনে মাটির ফিনফিনে পেয়ালা-পিরিচে চা দেওয়া হয়। উদ্‌বোধনের দিন সবাইকে বিনে পয়সায় চা খাইয়েছিলেন। বিকেলবেলায় আপিস ফেরত বাবুরা এখন নিয়ম করে ভিড় জমাচ্ছেন সে দোকানে। অদূরে যোগমায়া কালীবাড়ি।

এখন দুপুরবেলায় ভবেনবাবুর দোকানে খদ্দের প্রায় নেই। দোকান থেকে চল্লিশ পা হাঁটলেই থানা। দারোগাবাবুর নির্দেশে হাফপ্যান্ট পরা এক হাবিলদার চিনেমাটির পট ভরতি চা নিয়ে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। দোকানের ভিতরে শশীকান্তবাবু ফিনফিনে লাল পাড়ের ধুতি পরে চাদর গায়ে ফোর্থ ক্লাসের ছোকরা রাখালকে কলকাতার গল্প শোনাচ্ছিলেন। শশীকান্তর বয়স প্রায় ষাট। তবে দেখে বোঝা যায় না। অনেকদিন ইন্দোনেশিয়ায় প্র্যাকটিস করেছেন। কয়েক বছর হল শহরে ফিরে এসে মেতে আছেন অভিনয় নিয়ে। মাঝে মাঝেই কলকাতায় যান। ছেলেছোকরাদের কাছে কলকাতার মুখরোচক গল্প বলে বেশ আনন্দ পান তিনি। রাখাল তাঁর গল্পের অন্যতম ভক্ত। শশীকান্ত তাঁকে কাচকামিনী দেবীর গল্প শোনাচ্ছিলেন। কাচকামিনী সাংঘাতিক মহিলা ছিলেন। তাঁর বাড়ির কয়েকটা ঘর ছিল কাচের। সেই কারণেই তাঁর এমন নাম। সেই ঘরে তিনি চরস লুকিয়ে রাখতেন। কীভাবে এই চরস উদ্ধার করে কাচকামিনীকে গ্রেপ্তার করা হল, সে কাহিনিই সবিস্তার বর্ণনা করছিলেন শশীকান্ত।

হাবিলদারকে বিদায় করে ভবেশবাবু বর্মা চুরুট বার করে ধরালেন। ঘরময় মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। তিনি খুলনার লোক। ম্যাট্রিক ফেল করে জলপাইগুড়িতে চলে এসেছিলেন

কাজের খোঁজে। ভাগ্য ভাল ছিল বলে একটা চা-বাগানে চাকরি পেয়ে যান। তারপর বদলি হয়ে জলপাইগুড়িতে বাগানের হেড আপিসে চলে আসেন। অবসরের পর এই দোকান খুলেছেন। রাখালের মতো তিনিও কোনও দিন কলকাতা দেখেননি।

'কলকাতার পুজো দেখেছেন আপনি?' শশীকান্তর উদ্দেশে বললেন তিনি, 'শুনেছি বিরাট বিরাট টাগোর হয়?'

'টাগোর কী গো জেঠু?' রাখাল বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল।

শশীকান্ত হাসতে হাসতে বললেন, 'উনি খুলনার লোক। ঠাকুরকে বলেন টাগোর।'

'টাগোর মোটেই ভুল নয়।' ভবেশবাবু হেসে বললেন, 'ইংরেজরাও তো টাগোর লেখে। রবি টাগোর। আমরা যশোর-খুলনার লোকেরা ওটাই বলি। তা কলকাতার দুর্গা টাগোর নাকি দেখবার জিনিস? ভাবছি পরের বার পুজোর সময় কলকাতায় যাব।'

'পুজো তো ঢের দেরি। মাঘ মাসে চলুন আমার সঙ্গে। কলকাতার আসল জিনিস হল থিয়েটার আর বায়োস্কোপ, বুঝলেন? চ্যাপলিনের নাম শুনেছেন?'

'শোনা শোনা লাগছে। সে দিন জেলা স্কুলের ফার্স্ট ক্লাসের কয়েকটা ছেলে এসে গল্প করছিল। ওদের মুখেই শুনলাম যেন নামটা।'

'চ্যাপলিনের বায়োস্কোপ দেখবেন কলকাতা গেল। ওঃ! কী অ্যাক্টিং মশাই! এই তো পুজোর আগেই দেখে এলাম 'গোল্ড রাশ'। আমার পাশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিএ পাশ ছেলে বসে ছিল। সে চ্যাপলিনের সবক'টা বায়োস্কোপ আট-দশবার করে দেখেছে।'

'টাউনে বায়োস্কোপের হল খুললে কিন্তু বেশ হয়।' ভবেশবাবু উৎসাহ নিয়ে বলেন, 'কীরকম খরচ, সেটা জানেন?'

'খরচটা বড় কথা নয়।' শশীকান্ত মৃদু হেসে জানালেন, 'তার আগে টাউনে বিজলি আনতে হবে। ইলেকট্রিসিটি ছাড়া বায়োস্কোপের মেশিন চলবে কী করে!'

'মেলাতে যে দেখায় পেট্রোম্যাক্সের মতো আলো জ্বালিয়ে, হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে?' রাখাল তার অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করে।

শশীকান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে রাখালের কথা উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'আরে দূর! ওভাবে ছবি ভাল হয় না। কেউ হাঁটলে মনে হয় যেন দৌড়াচ্ছে। তা ছাড়া সাউন্ডের ফিল্ম, ছবির ফিল্ম একসঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে চালাতে গেলে ইলেকট্রিসিটি দরকার।'

'ছবিগুলো পর্দায় নড়ে কীভাবে বলুন তো?' ভবেশবাবু বেশ বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'এটা কিন্তু বেশ অবাক করা ব্যাপার।'

'সবই সাহেবের বুদ্ধি, বুঝলে না!' শশীকান্ত অমায়িক হেসে কারণ ব্যাখ্যা করেন, 'কলের গান শুনেছেন তো? চাকতির মধ্যে কেমন আওয়াজ লুকিয়ে থাকে। ঘুরলেই গান। তা রাখালকে দুটো কেক দিন তো! অনেকক্ষণ শুকনো মুখে গল্প শুনছে। তিন টাকা ডজনেরটাই দিন দু'খানা।'

ঠিক তখনই অমিয়র গৃহশিক্ষক নিত্যদাকে দেখা গেল ব্যস্ত পায়ে দোকানের দিকে এগিয়ে আসতে। নিত্যর সঙ্গে শশীকান্তর আলাপ আছে। দোকানে শশীকান্তকে দেখেই নিত্য সেদিকে এগিয়ে আসছিল।

'কী ব্যাপার হে নিত্য? আপিস যাওনি আজ?'

শশীকান্তর প্রশ্নের জবাবে নিত্য দোকানে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'জ্বর জ্বর ঠেকছে ক'দিন ধরে। আজ আর গেলাম না। মুখে স্বাদ পাচ্ছি না।'

'দেখো বাবা! ম্যালেরিয়া নয় তো?' শশীকান্ত উদ্বেগের সুরে বললেন, 'দুটো কেক খাবে নাকি? চা দিয়ে বিস্কুট?'

'বিস্কুট থাক। চা খাই।' নিত্য চেয়ারে বসে ধুতির খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। যদিও গরম নেই, কিন্তু তাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ঘাম মুছে জল খেয়ে সে শশীকান্তর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে দেখেই এলাম। সে দিন যে পালাটা শোনালেন, তার জন্য কয়েকটা গান লিখেছি।'

গত কয়েক মাস ধরে শশীকান্ত একটা নাটক লিখেছেন। নাম 'দেশের ডাক'। নাটকটা তিনি শুনিয়েছিলেন নিত্যকে। নাটকের জন্য ডজনখানেক গানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শশীকান্তর আবার গান লেখাটা আসে না। তাই সে ব্যাপারে নিত্যকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি। নিত্য গান লিখেছে শুনে তিনি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'লিখে ফেলেছ? তা সঙ্গে আছে নাকি? ভবেশবাবু, দু'কাপ চা বানান তো! ওই এক আনার পাতাটাই দেবেন।'

নিত্য পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বার করে বলল, 'সুর কে করবে বলুন তো? তার সঙ্গে সিটিং দিতে হবে একবার। অবশ্য আমি নিজেও সুর ভেবে রেখেছি।'

'তা সুর দিয়েই শোনাও না!'

'শোনাব?' নিত্যর মুখে এবার একটু হাসি দেখা গেল— 'আমার অবশ্য গানের গলা তেমন ভাল নয়। তবে আন্দাজ করতে অসুবিধা হবে না। প্রথম গানটা বেহাগে বেঁধেছি। কথাটা হল, আমি স্বপ্নেতে শুনি, তুমি কীভাবে গাও গুণী।'

চা বানাতে বানাতে ভবেশবাবু বললেন, 'এইরকম একটা গান রবি টাগোরের আছে না? সে দিন অনাদিবাবুর বাড়িতে গানের আসরে শুনলাম। সরোজেন্দ্রবাবু গাইছিলেন।'

নিত্য একটু থতমত খেয়ে বলল, 'থিমের মিল তো থাকতেই পারে। বেহাগ রাগিণীতে গাইছি। শুনলেই বুঝবেন আলাদা গান।'

কথা শেষ করে কাঁপা কাঁপা গলায় নিত্য গাইল—

আমি স্বপ্নেতে শুনি
তুমি কীভাবে গাও গুণী।
গ্রাম ছাড়া রক্তমাটির পথে
ওই যে তিনি অভ্রভেদী রথে।।

টি-পটে গরম জল ঢালতে ঢালতে ভবেশবাবু মন্তব্য করলেন, 'থিম, ভাব, ভাষা— সবই মিলে যাচ্ছে হে!'

শশীকান্ত অবশ্য ভবেশবাবুর কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'মন্দ হয়নি। তবে সুরটা বেহাগে ঠিক মানাচ্ছে না। ওটা কেদারা কিংবা হামির করে দাও। জয়জয়ন্তীও চলতে পারে। আর ঢিমে একতালায় গানটা ফুটছে না। লয় বাড়িয়ে তালটা তেতালা করো। পরের গানটা কী লিখেছ?'

নিত্য কাগজ উলটে আবৃত্তি করল, 'আমার সোনার ভারতবর্ষ, আমি তোমা পানে হাসি।'

ভবেশবাবু হতাশ গলায় ট্রে-তে কাপ আর পট সাজাতে সাজাতে বললেন, 'এই গানটা তো কংগ্রেস আপিসের সামনে সে দিন একটা সভায় ছেলেরা গাইছিল। তবে কথাটা একটু আলাদা ছিল, এই যা।'

নিত্য সে কথায় কান না দিয়ে সুর লাগিয়ে গাইবার উদ্যোগ নিতেই একটা কোলাহল ভেসে এল রাস্তা থেকে। দেখা গেল, লোকজন এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে। বোঝা গেল, কিছু একটা ঘটেছে। কী ঘটেছে তা জানার জন্য শশীকান্ত দোকান থেকে রাস্তায় নামতেই কে জানি বলল, 'কদমতলায় ইউনিয়ন জ্যাকে আগুন দিয়ে দিয়েছে।'

শশীকান্ত কথাটা শুনে আবার দোকানে এসে বসে পড়লেন। ইতিমধ্যে থানা থেকে একগুচ্ছ সেপাই লাঠি আর বন্দুক নিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে কদমতলার দিকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেদিক থেকে দুটো বিকট শব্দ ভেসে এল। সে শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই আবছাভাবে কানে এল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি।

ভবেশবাবু শান্তভাবে চায়ের সরঞ্জাম নিত্যর সামনে টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন, 'মনে হয় বোমা ফাটাচ্ছে। পটকা ফাটিয়ে বাবুরা ইংরেজ তাড়াবেন! হুঃ!'

কথাটা শুনে নিত্যর হঠাৎ মন হল যে, ভবেশবাবুর মাথায় গরম চা ঢেলে দিতে পারলে তার ভারী আনন্দ হত। সে নিরীহ মানুষ। তবুও আজ আচমকা এমন মনে হল তার। কেন মনে হল, কে জানে!

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

রাতদুপুরে ডাকাত এল তেড়ে

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স

মাস্টারমশাই ফিরছেন। সাইকেলে আস্তে আস্তে প্যাডেল ঘোরাচ্ছেন। অনেকদিন পর শহরে গিয়ে বেশ দেরি হয়ে গেল। বাড়িতে সবাই ভাবছে হয়ত। অথচ শরীর জুড়ে ক্লান্তি, জোরে প্যাডেল ঘোরাবার সাধ্যি নেই। খয়েরবনের কাছে এসে গা-টা ছমছম করতে লাগল। বাঁ দিকের একটি গাছে ক'দিন আগেই একজন ফাঁসি দিয়েছে। সে দিনও শহরমুখো তিনি। ভিড় ঠেলে ডেডবডি দেখবার পর খুব খারাপ কেটেছে ক'টা দিন।

একটু জোরেই সাইকেল চালালেন তিনি। ধরলা নদীর কাছাকাছি এসে একটু গতি কমালেন। আজ কোনও চিতায় আগুন নেই। কেউ মরেনি হয়ত আজ। ভাল লাগে মড়া পোড়ার দৃশ্য দেখতে।

ব্রিজের মাঝামাঝি পৌঁছালেন জীবন-মৃত্যু নিয়ে ভাবতে ভাবতে। হঠাৎ চমকে উঠলেন। আবছায়া একগুচ্ছ মানুষ এগিয়ে আসছে তার দিকে। ভূত নাকি! এতদিন রাতবিরেতে যাতায়াত করছেন! কোনও দিন অলৌকিক কিছু নজরে আসেনি তো! আজ কী হল!

ঘিরে ধরল তাঁকে ষণ্ডাগন্ডা ছ'-সাতজন।

'হল্ট! হল্ট! কী আছে দে শালা!'

গলাটা চেনা চেনা ঠেকল।

হাতে চকচক করছে ছুরি। অল্প চাঁদ আছে আকাশে।

'বার কর শালা কী আছে পকেটে, ব্যাগে। নইলে জান নিয়ে নেব।'

আবার গলাটা চেনা চেনা ঠেকল বড্ড।

তিনি সাইকেল থেকে নামলেন।

'তোমরা কে?'

'শালা, আমাদের পরিচয় চায়! মাল বার কর বুড়ো। নইলে—'

চমকে উঠলেন মাস্টারমশাই। এ গলা তো তাঁর ভীষণ চেনা।

'কে?'

'মারব গুলি।' কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে ডাকাতদলের পান্ডা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ জ্বাললেন। সরাসরি মাস্টারমশাইয়ের মুখে। চোখ বন্ধ করে ফেললেন তিনি।

আর হঠাৎ করে টর্চ নিবিয়ে ডাকাত সর্দার ফিসফিস করে বলল, 'বাবা তুমি!! এত রাতে? পালা সবাই—'

নিমেষে ডাকাতদল অন্ধকারে উধাও।

সাইকেল ধরে মধ্য সেতুতে মাস্টারমশাই দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। বুকে ভয়ংকর জ্বালা।

ধরলা নদীর পাশের গ্রামে আমরা যারা থাকতাম, তারা কত গল্প শুনেছি এই ঝড়ু ডাকাতের। শহরের কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট। শিক্ষক-বাবার ছেলে একের পর এক দুর্ধর্ষ ডাকাতি করে ত্রাস হয়ে উঠেছিল।

মনে পড়ে সে রাতটার কথা। এখন তো গ্রামে গ্রামে রাতপাহারা উঠেই গিয়েছে। ডাকাতিও নেই প্রায়। ডাকাতরা এখন কাঠচোর কিংবা পাচারকারী। সন্ধ্যারাতে গ্রামে খবর এল, আজ ডাকাত পড়বে! কানে কানে কত শলাপরামর্শ। এখানে-ওখানে জটলা। এ বাড়ি-ও বাড়ি থেকে এল মোটা লাঠি, পুরনো তরোয়াল, বিশাল দাঁ, মাছ গাঁথবার বর্শা, আরও কত কী! সন্ধ্যা সাতটাতেই খাওয়াদাওয়া শেষ। গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। আটটাতেই মধ্যরাত। গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে পাকা রাস্তা। বাঁশঝাড়ের পাশে, পুকুরের এক ধারে, বাঁশের মাচানে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে পাহারায় বসল গ্রামের যুবক ও মাঝবয়সিরা। উত্তেজনায় বিড়ি খেতেও ভুলে গিয়েছে নেশাখোর।

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ দূর থেকে কিছু টর্চ দেখা গেল। সবাই রুদ্ধশ্বাস। সাংঘাতিক কিছু একটার জন্য। হাত কাঁপছে কারও কারও।

টর্চ এগচ্ছে। বুকের ধুকপুক বাড়ছে। ঠিক হল, অকস্মাৎ চারদিক থেকে আক্রমণ শানাতে হবে ডাকাতদলের উপর। সব ক'টাকে রাতেই শেষ করা হবে— অতি রক্ত গরম কয়েকজন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

ছোট বোয়ালমারির রাস্তা পেরিয়ে টর্চগুলো এগিয়ে এল জামতলায়। একটা শিস। আর চারদিক থেকে ধেয়ে এল পাহারাদাররা।

ডাকাতদলের কণ্ঠে আর্তনাদ। ছ'জনের একটা দল।— 'বাঁচাও'।

এবার গ্রামবাসীর হাতে জ্বলে উঠল পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। সরাসরি ডাকাতদের মুখে।

লাঠি প্রায় মাথায় পড়ে তাদের। একজন বর্শা বিঁধতে এগচ্ছে।

—কাকু, আমরা ডাকাত নই। আমি নিমাই। ওরা গণেশ শ্যামল অরুণ... কাতর গলায় ডাকাত সর্দার বলে উঠল।

—তা-ই তো! ডাকাত কই? এরা তো গ্রমেরই ছেলে।

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ দূর থেকে কিছু টর্চ দেখা গেল। সবাই রুদ্ধশ্বাস। সাংঘাতিক কিছু একটার জন্য। হাত কাঁপছে কারও কারও। টর্চ এগচ্ছে। বুকের ধুকপুক বাড়ছে। ঠিক হল, অকস্মাৎ চারদিক থেকে আক্রমণ শানাতে হবে ডাকাতদলের উপর। সব ক'টাকে রাতেই শেষ করা হবে— অতি রক্ত গরম কয়েকজন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

লাঠি, বর্শা নামল।

—কোথা থেকে এত রাতে?

কাঁচুমাচু গলায় মিনমিন করে ওরা উত্তর দিল, 'ভবানী সিনেমায় 'ববি' চলছে। আমরা সিনেমা দেখে ফিরছি। নাইট শো।'

একজন বয়স্ক বলে উঠলেন, 'ছি ছি, বলতে লজ্জা করে না! মধ্যরাতে ব্লু ফিল্ম দেখে ফিরছে!'

সাতের দশকের গোড়ায় 'ববি' মানেই ব্লু ফিল্ম! ডাকাতি করা আর ওই সিনেমা দেখা এক ব্যাপার কারও কারও কাছে।

আর এখন ডুয়ার্সেই ব্লু ফিল্ম তৈরি হয়। মোবাইলে মোবাইলে বিএফ-এর ছড়াছড়ি।

শেষ একটি গল্প বলে ভাঙা আয়নার কাচে ভেসে ওঠা ডাকাতির পর্ব শেষ করি।

নতুন জামাই ফিরানিতে গ্রামের শ্বশুরবাড়িতে এসেছে। বর্ষা-রাত। খেতে খেতে রাত হয়েছে। তারপর ঘুম। মধ্যরাতে কাঁচা মেঝে খুঁড়ে ডাকাত ঢুকল ঘরে। নকশালদের দৌরাত্ম্যও তখন ভীতি ছড়িয়েছে। নতুন জামাই আবার রাজনীতির সঙ্গে ভীষণ জড়ানো। ডাকাত সর্দার ঘরে ঢুকেই জামাইয়ের নাম ধরে জানতে চাইলেন, তিনি কোথায়। নববধূ এক কোণে লেপ দিয়ে ঢেকে দিল তাকে। ডাকাতরা চাবি খুঁজতে তোশক ওলটাল। আর জামাই চাপা পড়লেন তার নিচে।

এবার আলমারি ভেঙে জিনিস নামাতে লাগল তারা। একের পর এক নতুন শাড়ি নামতে লাগল। ডাকাতদের হাত ছুঁল সেই শাড়িটি, যার ভিতরে যাবতীয় গয়না রেখেছে নতুন বউ। মরিয়া হয়ে সে বলল, 'দাদা, সবই তো নিলেন! এই শাড়িটা আমার মরা মায়ের স্মৃতি। এটা ধরবেন না প্লিজ।' রিনরিনে গলার আবেদনে থমকে গেল ডাকাত। সর্দার বলল, 'সরে আয়। বোন একটা রিকোয়েস্ট করেছে। আর শাড়ি নেবার দরকার নেই।'

আলমারির কাচ ভেঙে দিয়ে ডাকাতদল বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। অক্ষত রইল সোনার গহনা।

বাড়ির ছোট মেয়ে চিনে ফেলল ডাকাতদের একজনকে। সে বারবার বলল, 'পাশে যে পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে, তার একজন ছিল ডাকাতদলে।'

অবাক কাণ্ড! সেই সূত্রে ধরা পড়ে গেল ডাকাতদল।

সেসব ডাকাতি উধাও এখন ডুয়ার্সে। কিন্তু অন্য অনেক আপদ এসে ভিড় করেছে। ডাকাতও একসময় নারীকে সম্মান জানাত, গায়ে হাত দিত না। আর এখন ডাকাত নেই, কিন্তু নারীর শরীর সুরক্ষিত নেই।

পথিক বর

আপনি কি 'এখন ডুয়ার্স'-এ লিখতে চান?

আপনিও হতে পারেন 'এখন ডুয়ার্স'-এর প্রতিবেদক। আপনার এলাকায় কোনও উৎসব, অনুষ্ঠান, মেলা হলে তা-ই নিয়ে প্রতিবেদন লিখে পাঠাতে পারেন। প্রতিবেদনটি যেন ২৫০ শব্দের মধ্যে হয়। সঙ্গে ছবি দিতে ভুলবেন না। লেখা পাঠান **'এখন ডুয়ার্স', মুক্তা ভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১। ই-মেল- ekhonduars**

ওঁ পিস ওঁ পিস ওঁ পিস

কলকেগ্রাম কলিকা সমিতির মজলিশের প্রধান বক্তা কলম সিং হরিদ্বার হইতে আনিত বৃহদাকার ছিলিমে মহাতামাক ভরিয়া বারকয়েক নিদারুণ ধূমগ্রহণের পর কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ থাকিয়া কহিলেন, 'শুনিলাম ওয়ার্ল্ড পিস ডে সন্নিকটে। যদি কয়েক পিস ইলিশ মৎস্য খাওয়াইবার প্রতিশ্রুতি দাও তো আমি উক্ত বিষয়ে কিছু বলিতে পারি।'

সমিতির ছোকরা সদস্য, নিকটস্থ থানার দারোগা কহিলেন, 'ফোন করিয়া দিতেছি। সীমান্তের চালনাকারীদের কর্তা আসিয়া খান দুই উপযুক্ত মৎস্য আপনার চরণে দিয়া যাইবে। আপনি শুরু করুন। ছেলের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে হইবে।'

কলম সিং প্রসন্ন বদনে সম্মুখস্থ ঠোঙা হইতে এক খণ্ড জিলাপি তুলিয়া মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করিলেন। ভাদ্র মাসের শেষ হইতে চলিল। তথাপি ভূতের মতো বৃষ্টি হইতেছে ডুয়ার্সে। চারদিক ভিজা। অভয়ারণ্যের সীমানা ঘেঁষা কালিকা সমিতির আড্ডা তাই জোর জমিয়াছে।

'ডুয়ার্সে এখন আর পিস নাই বুঝিয়াছ?' কলম সিং বলিতে শুরু করিলেন, 'শান্তিকে এখন পিস পিস করিয়া কাটিয়া রায়ডাকের জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইতেছে। পিস ছিল আমাদের কালে। আহা! কী স্বর্গীয় পিস! প্রভাতে উঠিয়া একখানি কুড়াল লইয়া অরণ্যে যাইতাম। সারা দিনমানে দুইখানি গাছ কাটিয়া একখানি ঘুষ দিয়া অপরটি বন বিভাগের গাড়িতে চাপাইয়া বাড়ি লইয়া আসিতাম। আমার সহিত অরণ্যে কাঠ কাটিতে যাইত এমন কত লোক পরবর্তীকালে বিধায়ক-সাংসদ-মন্ত্রী-পঞ্চায়েত হইল, তাহার লেখাজোখা নাই। কী শান্তিতেই না সেইসব কাজ করিতাম। ডুয়ার্সে তখন না ছিল চোঙাধারী জার্নালিস্ট, না ছিল পর্যটক। সর্বত্র তখন ওঁ পিস ওঁ পিস ধ্বনি শুনা যাইত।'

দারোগা ইহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়া বলিল, 'এখন নাই বলিতেছেন? কেন? এখন তো ডুয়ার্সে বড়ই শান্তি। গম্মেন্ট বলিতেছে এই কথা।'

কথায় বাধা পড়িলে কলম সিং চটিয়া যায়। কিন্তু এইক্ষণে না চটিয়া মিটিমিটি হাসিয়া কহিলেন, 'গম্মেন্টের কথা ছাড়ো। তোমার কী মনে হয় তাহা বলো। অতীতে

আমরা অরণ্যে চড়ুইভাতি করিয়া যাইতাম। গাছের ডাল কাটিয়া, হরিণ বধ করিয়া চমৎকার বনভোজন করিতাম। এইসব তোমরা আইন বানাইয়া বন্ধ করিলে বটে, কিন্তু ফল কী হইল? এখন অরণ্য হইতে হাতি আসিয়া মিডডে মিলের চাল ভ্যানিশ করিতেছে। লোকালয়ে বাইসন ঢুকিয়া দলমত নির্বিশেষে গুঁতাইতেছে। কপিদের দল সেলুনে ঢুকিয়া আয়নায় মুখ দেখিতেছে। ইহাকে তুমি শান্তি বলো?'

পাশ হইতে প্রাথমিক স্কুলের হেড স্যার গবাক্ষবাবু কহিলেন, 'ঠিক বলিয়াছেন দাদা! নট আ সিংগল পিস অব পিস উইল বি ফাউন্ড!'

প্রশংসা শুনিয়া কমল সিং প্রীতনেত্রে আরেক খণ্ড জিলাপি গ্রহণ করিয়া হাসিলেন। দারোগা বিষণ্ণ বদনে কহিল, 'ইহা অন্যায় দাবি। আমরা বৃক্ষচ্ছেদন কি বন্ধ করি নাই? অরণ্যে এখন অখণ্ড শান্তি। গম্মেন্ট বলিয়াছে।'

কলম সিং এক চুমুক জলপান করিয়া শিবনেত্রে কহিলেন, 'বাজে কথা শুনিলে আমার নেশা ছুটিয়া যায়। তবে তুমি অর্বাচীন যুবক। গম্মেন্টের মোহে পড়িয়াছ। অতীতে আমরা কয়েকজন চুপচাপ কাঠ কাটিতে যাইতাম। পাশে বৃক্ষটিও তাহা টের পাইত না। এখন তো বারমুডাধারী, আলুর চিপস-হস্ত পর্যটকরা অরণ্যের গভীরে আইটেম নেত্য করিতেছে। যদিও বা বর্ষায় কিঞ্চিৎ শান্তি বিরাজ করিত, এখন সেইখানেও হস্তক্ষেপ করিবে শুনিলাম।'

'দৈনিক শালকাঠ সংবাদ'-এর নবীন সাংবাদিক এতক্ষণ রক্তচক্ষে ঢুলিতেছিলেন। এইবার তিনি সজীব হইয়া কহিলেন, 'আপনি ঠিক কহিতেছেন না। উন্নয়নের জোয়ারে শান্তি ভাসিয়া আসিতেছে। ডুয়ার্সের

জলে-স্থলে-আকাশে-বাতাসে-পাতালে-পাহাড়ে বিরাজিত শান্তি চোখে পড়িতেছে না আপনার?

'পঞ্চায়েতের টিকিট পাইতেছ নাকি?' কলম সিং সন্দেহের সুরে জানিতে চাহিলেন।

সাংবাদিক থতমত খাইয়া বলিল, 'আপনি কী করিয়া টের পাইলেন?'

জবাব না দিয়া কলম সিং পুনরায় জলপান করিয়া একখানি বিড়ি ধরাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'বিশ্ব শান্তি দিবসে শুনিলাম মিছিল-মিটিং-সভা হইবে। কবুতরও ছাড়া হইবে। কিন্তু শান্তির কিছু নমুনা দিলে খুশি হইতাম। ডুয়ার্সের সীমানার ওপারে গোর্খা, এপারে উপজাতি-জনজাতি আলাদা আলাদা পতাকা লইয়া আস্ফালন করিতেছে। কোচবিহারে বংশীবদনবাবু লম্ফঝম্প করিতেছে। বন্ধ বাগিচার শ্রমিকরা শুকাইয়া কাঠি হইতেছে। মেয়েরা পাচার হইতেছে। হাসপাতালে চিকিৎসক বাড়ন্ত। দলে দলে লোক গম্মেন্টে যোগ দিতেছে। ধর্ষণাদি অপকর্ম পাখা মেলিতেছে। শান্তি কোথায় পাইলে হে ছোকরা?'

দারোগা চিন্তিত মুখে কহিলেন, 'আর বলিবেন না। আপনার কথা চক্রান্তকারী বিরোধীদের মতো শুনাইতেছে। ইহার পর গ্রেপ্তার না করিলে সুন্দরবনে বদলি লইতে হইবে। ছেলের প্রবন্ধে এইসব লিখিলে গোল্লা পাওয়া আটকানো কঠিন। বউ ডিভোর্স দিবে। আপনি শান্তির কথা উচ্চারণ করুন। দরকার পড়িলে আমি মাথাভাঙা থেকে বাজেয়াপ্ত করা মহাতামাকের বান্ডিল আনিয়া দিব।'

সাংবাদিক সমর্থনের সুরে কহিল, 'ঠিক কথা! আপনি ছিদ্রান্বেষীর চক্ষু দিয়া অবলোকন করিতেছেন, তাই সর্বত্র শান্তিহীনতা দেখিতেছেন। আমরা কি ক্রমাগত আর্টিক্‌ল লিখিয়া জঙ্গি আন্দোলনের বারোটা বাজাই নাই?'

কলম সিং তাচ্ছিলের ভঙ্গিতে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, 'জঙ্গিরা তো ডুয়ার্সে বসিয়া দুধ-ভাত খাইতেছে আর ফন্দি আঁটিতেছে। আমার ধারণা, উহারা এইখানেই বসবাস করে। সেই কারণে এইখানে কিছু করিতেছে না। কেহ কি নিজের বাসস্থান ডিনামাইট দাগিয়া উড়াইয়া দেয়?' তাহার পর বৃহৎ কলিকাপাত্র হস্তে তুলিয়া দারোগার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'শান্তি কেবলমাত্র এইখানেই বিরাজমান। টানিবে নাকি?'

হেড স্যার গবাক্ষবাবু আহ্লাদিত কণ্ঠে কহিলেন, 'শান্তি দিবসে কাকভোরে উঠিয়া টানিব দাদা! তাহা হইলে বিদ্যালয় ফাটাইয়া বক্তৃতা দিতে পারিব। বিদ্যালয়ে চারজন মাত্র শিক্ষক। তাহার মধ্যে তিনজন ব্যস্ত থাকে ভোটার তালিকায় নাম তুলিতে। আর সহ্য হয় না। ইহা যদি শান্তির নমুনা হয় তো ডুয়ার্সে শ্মশানের শান্তি চলিতেছে, বুঝিলেন?'

দারোগা অবাক চক্ষে গবাক্ষবাবুর দিকে তাকাইয়া কহিলেন, 'সে কী মাস্টর! তোমার চাকরির ভয় নাই?' তারপর কলম সিং-এর উদ্দেশে কড়া গলায় বলিলেন, 'এইবার ছেলের প্রবন্ধের পয়েন্টগুলি উল্লেখ করুন তো! বিষয় হইল, বিশ্ব শান্তি দিবসে ডুয়ার্স।'

'কেবল মহাতামাক সেবনে ইহা লইয়া বলা মুশকিল। আপনার নিকট বাজেয়াপ্ত করা আর কিছু আছে? বাদামি চিনি, জুতোর কালি, আঠা— ডুয়ার্সে তো এইসব সেবন করিয়া শান্তিলাভের উপায় হইয়াছে। থাকলে দিন তো!'

'আফিমের গুলি দিতে পারি।' দারোগা পকেট হইতে কাগজের ছোট্ট প্যাকেট বাহির করিয়া কহিলেন। কলম সিং দ্রুত দুইখানি গুলি জিবের নিচে রাখিয়া কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হইয়া গেলেন। তাহার পর সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, 'আহা! কী শান্তি গো মামা!'

—তবে! সাংবাদিক এবং দারোগা সমবেত কণ্ঠে বলিলেন।

—পায়রা লইয়া আসো। আমি বিশ্ব শান্তি দিবসে উড়াইব। পরে কাটিয়া মাংস খাইব। কলম সিং-এর কণ্ঠে যেন সুধা ঝরিয়া পড়িল, 'তোমার ছেলের প্রবন্ধের পয়েন্ট লিখো দারোগা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন।' দারোগা মোবাইলের রেকর্ডিং ব্যবস্থা চালু করিয়া আগাইয়া বসিলেন।

'শ্যামলিমা আচ্ছাদিত, নদীকল্লোলিত, হিমালয়শোভিত, অরণ্যমুখরিত ডুয়ার্স হইল চিরশান্তির স্থান।' কলম সিং কহিতে লাগিলেন। মিনিট দশেক ধরিয়া শান্তির ললিত বাণী উচ্চারণ করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, ডুয়ার্সের কণায় কণায় ছড়িয়ে আছে টুকরো টুকরো শান্তি। পিসেস অব পিস। শান্তিপিস। তাঁহার আশ্চর্য বক্তব্য শুনিয়া সমিতির সকলেই আপ্লুত হইয়া পড়িল। রেকর্ডিং শেষ হইলে দারোগা তৃপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, 'এইটা আগে বুঝিলেই তো অশান্তি হইত না। কেন চক্রান্তকারী বিরোধীর ন্যায় ভাট বকিতেছিলেন এতক্ষণ?'

কলম সিং ফিসফিস করিয়া কহিলেন, 'আচ্ছন্ন হইয়াছি ভাই। আচ্ছন্ন না হইলে শান্তির মলাটে অশান্তির গ্রন্থ ঢাকিব কী করিয়া?'

কিন্তু উক্ত ফিসফিসানি কেহ শুনিল না। বৃষ্টি ধরিয়াছিল। ভেজা বাতাস বহিতেছিল চারিপার্শ্বে। পার্শ্বস্থ অরণ্য হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল কাঠকর্তনের ঠকঠক ধ্বনি। ডুয়ার্সের অরণ্য আরও একটু ফাঁকা হইতেছিল সেই ক্ষণে।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রহেলিকার ডুয়ার্স

'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার গত সংখ্যা পড়ার পর পটলরাম পর্যটকের মাসতুতো দাদা, প্রখ্যাত নদী বিশেষজ্ঞ দামোদরবাবু খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। সেই বিচলন থেকে তিনি পুজোর আগেই কবিতা লিখে প্রকাশ করতে চলেছেন 'নদীর ভিতর দধি' নামক কাব্যগ্রন্থ। প্রতিটি কবিতায় নাকি ধরা থাকছে ডুয়ার্সের একটি করে নদীর নাম। সেই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির ফোটোকপি জোগাড় করে পটলরাম ঠিক করেছেন, প্রহেলিকার জন্য আগাম কয়েকটি আমাদের ব্যবহার করতে দেবেন। বিনিময়ে তাঁকে 'আড্ডাঘর'-এ দু'ঘণ্টা কবিতাপাঠের সুযোগ দিতে হবে। প্রস্তাবটা কর্তাব্যক্তিদের কাছে পাঠাতেই তাঁরা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'দু'ঘণ্টা সইবে না। বড়জোর সাড়ে সাত মিনিট দেওয়া যেতে পারে।' তা পটলরাম তাতেই রাজি হওয়ায় উক্ত পাণ্ডুলিপি থেকে তিনখানা পদ্য প্রহেলিকা হিসেবে ছাপার সুযোগ পাওয়া গেল। পড়ে জানান দেখি কোন তিনটে নদীর কথা তিনটি কবিতায় বলা হয়েছে।

১

আহা নদী, তোর সনে/ যোগ নাই গঙ্গার।/ ঠিক নহে তোর কোলে/ ভাসি যায় অঙ্গার।।

২

হে বিচিত্রা নদী/ তব দু'টি অক্ষর যদি/ করি রে গ্রহণ/ ঊষর যে হয় অনুখন।।

৩

ভো ভো বিলাতি নাম্নী জলধারা।/ তোমা বিনা অরণ্যদেব দিশাহারা।।/ মধ্য যদি কাটি লয় কাকা।/ মেলে দেয় পাখা।।

গতবারের উত্তর— ১) জটিলেশ্বর ২) দোতারা ৩) রামশাই

ব্যাসকূট বসু

উত্তর পাঠান ই-মেল বা ডাক মারফত। সঠিক উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হবে আগামী সংখ্যায়। সেই সঙ্গে নতুন ধাঁধা পাঠাতে পারেন আপনিও। তবে তা অবশ্যই ডুয়ার্স সম্পর্কিত হতে হবে।

গল্পের আসর

২০ অগাস্ট, শনিবারের সন্ধ্যায় 'এখন ডুয়ার্স'-এর আড্ডাঘরে বসেছিল গল্পপাঠের আসর। শুধুমাত্র গল্পের খাতিরেই ওখানে হাজির হয়ে গেলেন দুর্গাপুর থেকে সৌম্যশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি জন্মসূত্রে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্রোমোজোম বহন করছেন। পড়লেন তাঁর অনবদ্য 'আকাশলীনা ও দধীচির ব্যাটেন' গল্পটি। শিলিগুড়ি থেকে এলেন কবি সেবন্তী ঘোষ, যিনি একজন শক্তিশালী গল্পকারও। তা আর একবার তিনি প্রমাণ করলেন তাঁর 'গন্ধ' গল্পটি শুনিয়ে। স্থানীয়দের মধ্যে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর 'কুলধারা', তনুশ্রী পালের 'যুদ্ধের মতো', মণিদীপা নন্দী বিশ্বাসের 'প্রতিবিম্ব',

তপতী বাগচীর 'পিকনিক, ইশা ও একটি জলচৌকি', শাঁওলি দে-র 'হলুদ খাম', অনিন্দিতা গুপ্ত রায়ের 'আজা নাচ লে', হিমি মিত্র রায়ের 'কাগজ', দেবাশিস কুণ্ডুর নামহীন গল্পটিও ছিল চমকে দেওয়ার মতো। প্রসঙ্গত, পরবর্তী গল্পপাঠের আসর ১০ সেপ্টেম্বর বসবে বলে স্থির করা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

বিনোদিনী গাথা

প্রায় পাঁচ বছর বন্ধ থাকার পর 'বিনোদিনী গাথা' দিয়ে আবার নতুন করে পথচলা শুরু করল কোচবিহারের 'সুরের সেপাই' সংস্থা। গত অগাস্ট মাসের শেষ রবিবার স্থানীয়

রবীন্দ্রভবনে তারা মঞ্চায়িত করল তাদের চতুর্থ প্রযোজনাটি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা রঙ্গমঞ্চে অসামান্যা অভিনেত্রী নটী বিনোদিনীকে নিয়ে করা এই প্রযোজনাটি মূলত ছিল সংগীতনির্ভর। সেই সময় বাংলা গানের মধ্যে যে একটা মিক্স ম্যাচ কালচার এসেছিল, এখানে ঠিক সেই ধরনের গানগুলোকে তুলে ধরা হয়েছে নটী বিনোদিনীর জীবনগাথা বোঝাতে। গানের সঙ্গে নাচও এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবে। 'বিনোদিনী গাথা' তৈরি করে মঞ্চায়িত করার ভাবনা যাঁর, সেই সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য নিজে একজন সুলেখিকা। এই নৃত্যগীতি আলেখ্যটিকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরার জন্য তিনি শুধু পড়াশোনা করেই ক্ষান্ত হননি। মঞ্চে সেই বাবু কালচার, সাবেকিয়ানাকে তুলে ধরার জন্য তিনি যে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন তা মঞ্চের পরিবেশ এবং কুশীলবদের সাজসজ্জাতেই প্রকাশ পেয়েছে। প্রত্যেকের পোশাক ও রূপসজ্জা ছিল যথাযথ, একেবারে সাবেক আমলের ষোলো আনা বাঙালি। নটী বিনোদিনীর চরিত্রে পিয়াসী চক্রবর্তীর সাবলীল অভিনয় দর্শকদের মন জয় করেছে। তবে 'বিনোদিনী গাথা'য়
সকল দর্শক ও শ্রোতার মন কেড়ে নিয়েছেন দু'জন নতুন শিল্পী— মহিলা কণ্ঠে মুনমুন সরকার এবং পুরুষ কণ্ঠে সব্যসাচী সরকার তাঁদের অনবদ্য গানে। পেশায় স্কুল শিক্ষক সব্যসাচী সরকারের গাওয়া বৈঠকি, টপ্পা গানগুলি এক কথায় অনবদ্য। বিভিন্ন পুরুষ চরিত্র— শ্রীরামকৃষ্ণ, গিরিশ ঘোষ, গুর্মুখ রায়— এঁদের সংলাপে কণ্ঠদান করেছেন ঋষিকল্প পাল।

'বিনোদিনী গাথা' কেন— এই প্রশ্নের উত্তরে সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য জানান, 'বিনোদিনী সে যুগের হলেও আজও সমান প্রাসঙ্গিক। তাঁর আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়েই মঞ্চে আজ মেয়েদের এত জয়জয়কার। তবুও অলক্ষ্যে থেকে গিয়েছেন তিনি। গোটা জীবনটাই তাঁর প্রবঞ্চনার। পতিতাপল্লি থেকে উঠে এসে নাট্যজগতের শীর্ষে থাকা, এইচএমভি-র শিল্পী হওয়া— সবকিছুর পরও তাঁকে আবার ফিরে যেতে হয়েছিল সেই পতিতাপল্লিতেই। এই ফেসবুক-টুইটারের যুগে আমি নতুন প্রজন্মকে বিনোদিনী সম্পর্কে একটা মেসেজ দিতে চেয়েছি। সে যুগে না-ক্লাসিক্যাল, না-লোকগীতি, একটা অদ্ভুত সস্তা ধরনের গান চলত। এখানে তাই গিরিশ ঘোষের বৈঠকি গান যেমন রয়েছে, তেমনি টপ্পা, মুজরো, খ্যামটা গানও রাখা হয়েছে। যারা এই 'বিনোদিনী গাথা'য় অভিনয় করেছে— প্রত্যেকেই নতুন। এদের নিয়ে কাজ করতে পেরে ভীষণ ভাল লেগেছে।'

তবে এত সুন্দর অনুষ্ঠানে একেবারে খাপছাড়া লেগেছে সঞ্চালনা। সঞ্চালক পার্থ বণিক এ ব্যাপারে আরও একটু যত্নবান হতে পারতেন। উচ্চারণে দুর্বলতা ও পেশাদারিত্বের অভাব অনুষ্ঠানের পক্ষে তো বটেই, দর্শকদের মধ্যেও বিরক্তির উদ্রেক করেছে।

কলা উৎসব

কোচবিহারে অনুষ্ঠিত হল জেলা পর্যায়ের কলা উৎসব। স্থানীয় ইন্দিরা দেবী বালিকা বিদ্যালয়ে আয়োজিত এই উৎসবে জেলার ১৬টি বিদ্যালয়ের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। গোটা উৎসবের আয়োজন করে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান, কোচবিহার ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তর। অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি পুষ্পিতা রায় ডাকুয়া। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মিহির গোস্বামী, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বালিকা গোলে, সর্বশিক্ষা মিশনের জেলা প্রকল্প আধিকারিক সহদেব শৈব প্রমুখ।

১৬টি বিদ্যালয়ের ৩৫টি দল এই অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক পালাগান, আঞ্চলিক নৃত্য, নাটক ইত্যাদি প্রদর্শন করে। এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম স্থানাধিকারীরা এর পর কলকাতায় রাজ্যস্তরে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন জানা গিয়েছে। এই কলা উৎসবের ফলে বিভিন্ন প্রতিভার বিকাশ ঘটবে এবং বিজয়ীরা জেলার মুখ উজ্জ্বল করবেন বলে আশাবাদী মিহির গোস্বামী।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

স্বাধীনতা কাপ জয়ী দৈমালু

আলিপুরদুয়ার আশুতোষ ক্লাব ত্রিশাখা আয়োজিত ১৮তম স্বাধীনতা কাপ জিতে নিল মারাখাতার দৈমালু ক্লাব। এ দিন ফাইনালে তারা বেলতলা সকার ইলেভেনকে টাইব্রেকারে ৪-১ গোলে পরাজিত করে। 'দেবু পাল/'বিশ্বদ্বীপ মৈত্র চ্যাম্পিয়ন ট্রফি 'তুষারকান্তি দাস/হরিপদ কুণ্ডু মেমোরিয়াল রানারস' ট্রফি ও আলোকি সাহা স্মৃতি কেয়ার প্লে ট্রফির তৃতীয় দিনের খেলায় মাঠে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ও উত্তরবঙ্গ ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান 'পাহাড়ি বিছে' বাইচুং ভুটিয়া। মাঠে প্রচুর দর্শকসমাগম হয়।

ফাইনালে উঠল সাতালি বস্তি

আলিপুরদুয়ারের কালচিনি মাঠে আয়োজিত ১৬ দলীয় কোদাইরাম জয়সওয়াল ও বুধরাম ওরাওঁ ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠল হাসিমারার সাতালি বস্তির তরুণ সংঘ। প্রথম সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে কামাখ্যাগুড়ির শিববাড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দেয়। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন সাতালি বস্তির অর্জুন কিসপোটা।

লিগ ফুটবলের সেমিতে গ্রিন

আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত ফুটবল লিগের সেমিফাইনালে উঠল গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি। ৫ সেপ্টেম্বর তারা চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে ৪-০ গোলে কালচিনি স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে দেয়। খেলাটি হয়েছে বিবেকানন্দ মাঠে।

সেমিফাইনালে ডুয়ার্স

মথুরা গেমস ক্লাব আয়োজিত মেকলেড রুসেলড ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনালে উঠল সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা-বাগান। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে ডিমা চা-বাগানকে হারায়।

পরিতোষ সাহা

সাব-জুনিয়র ও সিনিয়র ফুটবল লিগ

কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে কোচবিহার স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে সাব-জুনিয়র ও সিনিয়র ফুটবল লিগ। সাব-জুনিয়র ফুটবল লিগে এবার দলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০টি। আর সিনিয়র ফুটবল লিগে খেলছে ১৩টি দল। সাব-জুনিয়র ফুটবল লিগের প্রথম দিনের প্রথম খেলায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোচিং ক্যাম্প দেবীবাড়ি নতুনপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবকে ৬-১ গোলে হারায়। লিগের পরবর্তী খেলাগুলি কোচবিহার স্টেডিয়াম ছাড়াও কাকরিবাড়ি ও হরিণ চওড়ার মাঠে হবে। খেলাগুলো পুজোর পর অবধি চলবে। এখন থেকে শীতকালেও ফুটবল লিগ চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন ডিএস-এর সম্পাদক বিষ্ণুব্রত বর্মন। তিনি বলেন, ফুটবল খেলাকে আরও ছড়িয়ে দেবার জন্য আমরা শুধু স্টেডিয়াম গ্রাউন্ডে নয়, বাইরের মাঠেও খেলা করানোর কথা ভাবছি। এই কারণে মাঠের খোঁজও করা হচ্ছে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে ফুটবলের জনপ্রিয়তা বাড়াতে তাই জেলার বিভিন্ন মাঠে প্রায় সারা বছর ধরেই লিগ, টুর্নামেন্ট চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

ভলিবল

কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদ আয়োজিত আন্তর্বিদ্যালয় ভলিবল খেলায় ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তুফানগঞ্জের বাকলা রামকৃষ্ণ হাই স্কুল। স্থানীয় এমজেএন স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচে তারা রাশিডাঙা সাহেব মহম্মদ হাই স্কুলকে হারিয়ে দেয়। অন্য দিকে, মেয়েদের বিভাগের মধ্যে কোচবিহার উচ্চবালিকা বিদ্যালয় ইলাদেবী গার্লস' হাই স্কুলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ছেলেদের দল নির্বাচিত হয়েছে বলে জানান জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের সম্পাদক নৃপেন রায়। উত্তর দিনাজপুরের বিরুদ্ধে এলিমিনেশন রাউন্ড খেলার জন্য ইতিমধ্যে টিম শিলিগুড়ি গিয়েছিল। সেখানে উত্তর দিনাজপুর থেকে টিম না আসায় কোচবিহার দল 'বাই' পেয়ে সরাসরি রাজ্য পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। নদিয়ার বেথুয়াডহরিতে স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে ১২ জন খেলোয়াড় ও ২ জন ম্যানেজার-সহ ১৪ জনের দল গিয়েছে। মূলপর্বে ৮টি দল খেলবে বলে জানান তিনি।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

বই পত্রের ডুয়ার্স

মা-এর স্মরণে

প্রয়াত মাতা মাধবী গুহ রায়ের স্মরণে আলোচ্যমান ‘পারিবারিক অ্যালবাম’টি নির্মাণ করেছেন জলপাইগুড়ির গুহ রায় পরিবারের পক্ষে গৌতম গুহ রায়। এই নির্মাণে তাঁর সহযোগীদ্বয় হলেন তপন গুহ রায় এবং শঙ্খপ্রিয় গুহ রায়। গ্রন্থটি মাতৃভাবনাকেন্দ্রিক একগুচ্ছ গদ্য, পদ্য এবং চিত্রের সংকলন। এখানে যেমন রবীন্দ্রনাথের রচনা, জীবনানন্দ দাশের আত্মকথার অংশ, মা-কে লেখা বিদ্যাসাগর এবং নেতাজি সুভষচন্দ্র বসুর চিঠি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, তেমনই স্থান পেয়েছে একালের বেশ কয়েকজন লেখকের

কবিতা, গদ্য। পাশাপাশি রঙিন ও সাদা-কালো ছবিও স্থান পেয়েছে। চিত্রকরদের মধ্যে রয়েছেন রামকিংকর বেইজ, মকবুল ফিদা হোসেন, কে জি সুব্রহ্মনিয়ম-সহ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

সম্পাদকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘সংকলনটি একটি সূচনা পুস্তিকা মাত্র। এই সংকলনের কিছু লেখা সংগৃহীত, কিছু সংকলনের জন্যই লেখা।’ পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে যে, কোন কোন লেখা ‘সংকলনের জন্য লেখা’, তা উল্লিখিত হলে ভাল হত। কিছু কিছু অবশ্য অনুমান করা যায়। তবে সংকলনটি যে বেশ উপভোগ্য হয়েছে— এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ‘পারিবারিক অ্যালবাম’ হলেও সংকলনটির আবেদন যে কোনও মাতৃহারা ব্যক্তির অন্তরে ছাপ ফেলে যাবে।

সংকলিত কবিতাগুলি প্রতিটিই ‘মা’-এর স্মৃতিজলে সিক্ত। আলাদা করে কোনও কবিতার উল্লেখ করা অন্যায় হবে। পড়তে গিয়ে যে ভাগ্যবান পাঠক এখনও মা-হারা হননি, তিনিও এক অনিবার্য ভবিষ্যৎ যন্ত্রণার কথা ভেবে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বেন। অন্য দিকে ম্যাক্সিম গোর্কির ‘মা’ উপন্যাস বিশ্লেষণ করেছেন জাকির তালুকদার। দেখিয়েছেন, গোর্কির ‘মা’ কীভাবে উপন্যাসের নাম থেকে বেরিয়ে এসে সকলের আদর্শ হতে পারেন। রাহেল রাজীবের ‘কাঁটাতার ও দুধ মা’ নামক ছোট্ট রচনাটির শেষ বাক্যটি বড় মন খারাপ করে দেয়। যশোধরা রায়চৌধুরী লিখেছেন ‘মা’ হয়ে ওঠার কাহিনি, কিন্তু সেই ‘হয়ে ওঠা’র মধ্যে সমাজের একতরফা বিধিনিষেধ, প্রত্যাশা চাপিয়ে দেওয়ার অভিসন্ধি ধরা পড়ে যায়। মায়ের দায়িত্ব কি ‘বাই ডিফল্ট’?

বস্তুত, সংকলনটি নির্মাণে গৌতমবাবু সুচিন্তিত ভাবনার পরিচয় রেখেছেন। ‘মা’ শব্দের ব্যাপ্তি কত দূর বিস্তৃত, তা আরও একবার মনে হবে সংকলনটি পড়ার পর। এর শেষ অংশে স্থান পেয়েছে ‘মা’ মাধবী গুহ রায় সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের অনুভূতি ও আবেগ। ব্যক্তিগত রচনা হলেও পড়তে ভাল লাগে। একাধিক রঙিন ছবির কারণে গ্রন্থটির আবেদন ও মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধারণা। মীরা মুখার্জি, শ্রীজুম মুনস, গৌতম মুখার্জি, সুজান মুনস, কাঞ্চন ম্যান্ডেলে, মীনাক্ষী ঝাঁ ব্যানার্জি অঙ্কিত চিত্রগুলি ছাপার জন্য আলাদাভাবে আর্ট পেপার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি ছবিই সুমুদ্রিত এবং আবেদনমুখর। শ্রীজুম মুনসের ছবিটি আবার স্থান পেয়েছে প্রচ্ছদে। প্রথম ব্লার্ব-এ যে মন্তব্যগুলি স্থান পেয়েছে, সেগুলি গুহ রায় পরিবারের প্রতি জ্ঞাপন করা সমবেদনার অংশ বলেই অনুমান। গ্রন্থটি সংগ্রহযোগ্য।

মা। প্রথম উচ্চারণ প্রথম আলো।
সম্পাদনা গৌতম গুহ রায়। সোপান।
কলকাতা-৬। ১৫০ টাকা

কবিতার নবম উচ্চারণ

ইন্দ্রাণী সেনগুপ্তর ৮০ পাতার কবিতার বইটি দশটি পর্যায়ে বিভক্ত। ছ’টি পর্যায়ে গড়ে আট-দশটি কবিতা রয়েছে। চারটি পর্যায়ে কবিতার সংখ্যা তিন থেকে এক। প্রায় কুড়ি বছর ধরে কবিতাচর্চা করছেন ইন্দ্রাণী। ব্লার্ব থেকে জানা যাচ্ছে যে, তিনি দর্শনের অধ্যাপিকা এবং ‘বিবাহ ও পরিবার’ বিষয়ে গবেষণা করছেন। দর্শনাভিজ্ঞ ব্যক্তির মানসে এক ধরনের সারল্য অনুভব করা যায়। ‘সত্য’কে বহু দিক থেকে অন্বেষণ করার কারণেই জীবনের সরল রূপটি তাঁদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে। ইন্দ্রাণী এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর কবিতা পড়তে গিয়ে বারবার মনে হয়েছে যে, তিনি অনর্থক জটিলতা সযত্নে পরিহার করে নির্মাণ করেছেন কবিতার আপন পৃথিবী।

দশ পর্যায়ে বিভক্ত হলেও পর্যায়গুলির মধ্যে যোগসূত্র আছে। প্রথম পর্যায় হল ‘প্রেম’। তারপর ‘মহান নৈঃশব্দ্য’, ‘ভাঙন’, ‘আত্মজার কথা’— এভাবে এসেছে পরের পর্যায়গুলি। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আসলে নিজের জীবনের ধাপগুলিই ব্যক্ত করেছেন ইন্দ্রাণী। অন্তিম পর্যায়ের নাম ‘সম্বুদ্ধ’। শেষ কবিতার নাম ‘বোধিবৃক্ষের ছায়া’। কবি সম্ভবত আধ্যাত্মিক আশ্রয়ে এসে

তৃপ্তিলাভের ইঙ্গিত দিয়েছেন সব শেষে। পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে কবিতা ভাবনার বদল এলেও রচনাশৈলী পরিবর্তিত হয়নি। প্রথম পর্যায়ের কবিতায় পড়ি, ‘নক্ষত্রের গা থেকে ঝরে পড়া জলে/ সিক্ত হচ্ছে আমার বিনুনি/ তুমি আমাকে এভাবেই/ ভেজা চুলে দেখতে চেয়েছিলে।’ ভাঙন পর্যায়ে পাই ‘ওডিকোলনের গন্ধে ঘর ভিজে যায়/ পুরোন গন্ধ কি বেচা যায়?’ পঞ্চম পর্যায়ে (আমরা কথারা) লক্ষ করি, ‘মেয়েটার দু-চোখে এখন দূরবীন/ দূরের বিন্দুগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।’ শেষ কবিতার শেষ লাইনটি হল, ‘তনহাকে অতিক্রম করতে পারিনি, আজও’। ‘তনহা’ হল তৃষ্ণা। জীবনের ধাপগুলি আলো-অন্ধকার নিয়ে পেরিয়ে আসতে ইন্দ্রাণী এখনও অকপটে স্বীকার করতে পারেন ‘তনহা’র প্রতি আকাঙ্ক্ষার কথা। এই কপটত্ব তাঁর কবিতার মূলধন।

কিছুটা আত্মকথন, কিছুটা গল্পের ছলে ইন্দ্রাণী উচ্চারণ করেছেন তাঁর কবিতা। কোথাও কোনওরকম ক্রোধ অথবা আক্রোশ প্রতিফলিত হয়নি। হয়ত দর্শনের গভীর পাঠ তাঁকে ব্যক্তিগত স্তরে জীবনতিক্ততার ঊর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করেছে। জটিলতার আবর্তে তলিয়ে না গিয়ে প্রশান্ত চিত্তে নিজেকে ব্যক্ত করেছেন কবিতায়। কখনও কখনও কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখেছেন পৃথিবীকে। বইটি পড়তে পড়তে পাঠক সেই প্রশান্তি ও কৌতুকের ছায়া অনুভব করতে পারবেন। ‘কৃষ্ণ চড়েন হিরো হুন্ডায়/ পকেটে তাঁর মোবাইল বাঁশি/ রাধা পরেন না তো নূপুর পায়ে/ তিনি নিজেই হলেন ধ্বনি।’

সুদীপ দত্তর প্রচ্ছদে বইটির সারল্য প্রতিফলিত হয়েছে।

সন্ধ্যাসংগীত গাইছে বৃক্ষলতা।
ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত। প্রতিভাস।
কলকাতা-২। ১০০ টাকা

রজত অধিকারী

অরণ্য মিত্র

দুর্দান্ত কেএলও জঙ্গি পল অধিকারী এখন গোপন ডেরা ছেড়ে সমতলের পথে। গোপন ক্যাম্পে একরাত কাটানোর পর ভোরবেলায় শুনল সাংকেতিক পাখির ডাক। নবীন রাইয়ের হুকুমে রতন বিশ্বকর্মা পিছু নিয়েছে প্রখ্যাত চোরাচালানকারী নোটন বসুর। কেন? এদিকে, সুরেশ কুমারের তৎপরতায় নির্বিঘ্নে শুরু হয়ে গেল ‘ঋষিকাম’ ছবির শুটিং। মিরিকের লেকের সামনে অবসর কাটাতে এসে মনামির নতুন অভিজ্ঞতা হল একটি মেয়েকে ঘিরে। সুন্দরী ডুয়ার্সের তলায় রুদ্ধশ্বাস ঘটনার জাল এবার বিস্তৃত হচ্ছে কোন দিকে? বিতর্কিত অথচ বহুলপঠিত মেগাসিরিয়ালের আরও এক অন্ধকার পর্ব এবার।

৫২

ইসলামপুরের কাছে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভূমিকা পালন করে, বেশ প্রফুল্ল চিত্তে নোটন বসু শিলিগুড়ির দিকে ফিরছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে রাত আটটায়। তারপর ঘণ্টাখানেক সুন্দরী উদ্যোক্তা এবং তাঁর সুবেশা ও আকর্ষণীয় সখীদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ফস্টিনস্টি করে বেরুতে বেরুতে প্রায় সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছিল। অবশ্য নোটন বসু তেমন বাড়াবাড়ি করেননি। ইদানীং তিনি ‘ইমেজ’ রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হয়েছেন। বুদ্ধিজীবী হওয়ার জন্য মাইনে দিয়ে সেক্রেটারি রেখেছেন। আজকের সন্ধ্যায় যে বক্তব্যটা রেখে প্রচুর হাততালি পেয়েছেন, সেটা সেক্রেটারির লিখে দেওয়া। নোটন বসু মাধ্যমিক ফেল। বালুরঘাটে হিলি সীমান্ত দিয়ে প্রথমে গোরু পাচার, পরে ফ্রেন্সিডিল চালান করে ফুলেফেঁপে ওঠার পর আটত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছেন। বউ কবিতা লেখে। নাটকও করে। এক ছেলে, এক মেয়ে নিয়ে এখন সুখের সংসার নোটন বুসর। ফ্রেন্সিডিল চালানোটা অবশ্যি বন্ধ করেননি। পাশাপাশি প্রোমোটারি ব্যবসায় আরও ফুলে উঠেছেন। একটা চা-বাগানও কিনবেন কিনবেন করছেন। মেয়ে কলকাতায় মাসে দু'বার গান শিখতে যায়। ‘হেভি টিভি’র জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো ‘কণ্ঠ ঝরে মধু’তে তাঁর মেয়ে সম্প্রতি গান গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছে। দশচক্রে ভগবান ভূত হয়ে যায়। নোটন বসু হয়ে গিয়েছেন সংস্কৃতিপ্রেমী। আজ মঞ্চে নারীশক্তির উদ্‌বোধনের গুরুত্ব এবং রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তিনি যেটা বলেছেন, সেটা খুব দুরূহ কথা। কিন্তু নোটন বসু সেই দুরূহতা সহজেই দূর করে দিয়েছেন। ইংরেজিতে তাঁর খুব অ্যালার্জি, তাই সেক্রেটারি তাঁর লেখায় কোনও ইংরেজি কোটেশন রাখেননি। মোটামুটি সহজ ভাষায় লেখা বক্তৃতাটা নোটন বসু কিঞ্চিৎ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পড়লেও হাততালির অভাব হয়নি। শুধু তিনি বলতে ওঠার আগে সঞ্চালিকা যখন বলছিলেন যে, নোটনবাবু ছোটবেলা থেকেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছেন, তখন ফিক করে হাসি এসে গিয়েছিল। বক্তৃতা শেষ করার পর যখন ফোন মারফত জানতে পারলেন যে, দু'ট্রাক কাশির সিরাপ পাচার করার ব্যাপারে বিএসএফ-এর সঙ্গে ডিল সারা হয়ে গিয়েছে, তখন বেশ ফুরফুরে মেজাজ চলে এসেছিল।

বাইরে বেশ ঠান্ডা। গাড়ি চলছিল হু হু করে। নোটন বসু শিলিগুড়িতে ফ্ল্যাট কিনে রেখেছেন। পাচারের কাজ হিলিতে হলেও কথাবার্তা শিলিগুড়িতেই হয়। ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ যাতায়াতের ব্যবস্থা চালু হওয়ায় শিলিগুড়িতে কাজ সারতে এখন অনেক সুবিধা। অবশ্য সে যাতায়াত চালু না হলেও অসুবিধা ছিল না। সীমান্তের প্রহরীরা তাঁদের কাছে কোনও সমস্যাই নয়। নোটন বসু গাড়িতে বসেই চুকচুক করে হুইস্কি খাচ্ছিলেন। ড্রাইভার ছাড়া তাঁর সঙ্গে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি নেই। ড্রাইভারটিও খুব বিশ্বস্ত। নোটন বসুর হয়ে চারটে খুন করেছে এ যাবৎ। ইদানীং অবশ্য খুনোখুনির দরকার হয় না। কেরিয়ারের গোড়ার দিকে অবস্থান পোক্ত করার জন্য এসব করতে হয়েছিল।

পাঞ্জিপাড়া থেকে নোটন বসুর গাড়িটা অনুসরণ করতে শুরু করেছিল একটা ছোট নীল রঙের গাড়ি। সে গাড়ি চালাচ্ছিল রতন বিশ্বকর্মা। নোটন বসুর সঙ্গে একসময় কারবার করেছে

রাত দেড়টা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে বেশ ঝরঝরে শরীর আর মন নিয়ে পল অধিকারী ক্যাম্পের বাইরে এসে বসলেন। জঙ্গি হওয়ার আগে থেকেই তিনি শেষ রাত থেকে ভোর পর্যন্ত জেগে থাকতে পছন্দ করতেন। এই সময় তাঁর মাথা খুব ভাল কাজ করে। তিনি ক্যাম্পের বাইরে এসে দেখলেন আবছা অন্ধকারে চারদিক ঝিম মেরে রয়েছে। আজ শুক্লা একাদশী। চাঁদ বেশ উজ্জ্বল।

সে। আজ অনেকদিন পর দেখা হবে। শিলিগুড়িতে ঢোকার আগে একটা ধাবায় নোটন বসুর থামার কথা। সেখানে দুর্দান্ত রুটি, তরকা আর আচার পাওয়া যায়। নোটন বসুর প্রিয় ধাবা। শিলিগুড়িতে এলে সেই ধাবায় একবার তিনি পা রাখবেনই। রতন ঠিক করে রেখেছে ধাবাতেই মুখোমুখি হবে নোটন বসুর। সে জানে যে নোটন বসু এখন ইন্টেলেকচুয়াল হয়ে গিয়েছেন। পায়জামা, পাঞ্জাবি আর কাশ্মীরি চাদর জড়িয়ে সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেন। দেখে-শুনে বেশ ভালোই লাগে রতনের। টাকা কামালে রতনও 'ভানুভক্ত' নিয়ে মঞ্চে উঠে স্পিচ দিতে পারত।

রতন বিশ্বকর্মার অনুমানে ভুল ছিল না। 'সত্য সাঁই ধাবা'র সামনে এসে নোটন বসুর গাড়ি গতি কমিয়ে ঘুরে গেল। ধাবার সামনে বেশ খানিকটা জায়গা। রাত এগারোটাতেও মোটামুটি ভিড়। বেশ কয়েকটা দামি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। রতন দেখল, গাড়ি থেকে কাশ্মীরি চাদর জড়ানো নোটন বসু নামলেন। শালটা তিনি এখনও সামলাতে শেখেননি। পিছন দিকটা অনেকটা উঠে ছিল। কমলা রঙের পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরা নোটন বসুকে দেখাচ্ছিল সাহিত্যিকের মতো। এমনিতে তাঁর চেহারাটা সুন্দর। ফরসা, গোলগাল। কলপ করা চুল পাট করে আঁচড়ানো। গাড়ির সিটে হেলান দেওয়ার কারণে পিছন দিকটা একটু এলোমেলো হয়ে ছিল, এই যা। ধাবায় ঢুকে নোটন বসু একটু পিছনের দিকে একটা বেঞ্চিতে বসলেন। মুখোমুখি দুটো বেঞ্চ আর একটা টেবিল। জনা আটেক বসতে পারে। তবে এই মুহূর্তে নোটন বসু ছাড়া সেই টেবিলে আর কেউ নেই। রতন বিশ্বকর্মা গাড়ি বন্ধ করে ধীরপায়ে হেঁটে টুক করে বসে পড়ল নোটন বসুর মুখোমুখি। নোটন বসু একবার অলস চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে পরক্ষণে সোজা হয়ে বসে হেসে বললেন, 'আরে! রতন যে! কোত্থেকে?'

—পাঞ্জিপাড়া থেকে আপনার পিছু নিয়েছি দাদা!

—কেন? ফোন করলেই তো পারতে!

—আপনার এখনকার নাম্বার তো নেই দাদা। ইসলামপুরে ফাংশন কেমন হল?

—শালা, তুমি তো খোঁজ রাখো দেখছি! নোটন বসু হাসলেন— 'আমি এখন কালচারাল হয়ে গিয়েছি বুঝলে? চাঁদা-ফাঁদা দিতে হয় অবশ্য। তবে খারাপ লাগে না। শুনলাম আমার স্পিচটা লোকাল কেব্‌লে দেখাবে। কাগজে তো আমার নাম-টাম বেরুচ্ছে এখন। দৈনিক বাংলা সংবাদে তো ছবিও ছেপেছিল। দেখেছ?'

—আমি তো দাদা বাংলা পড়তে পারি না।

—শালা, জার্নালিস্টকে থ্রি স্টারে ডিনার খাওয়াতে হয়েছে সে জন্য। তবে ছবিটা ভাল প্রিন্ট হয়েছিল। আমি এখন বুদ্ধিজীবী, বুঝলে?

কথাটা বলে খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসলেন নোটন বসু। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'খবর বলো এবার।'

—সিরাজুলের ঠিকানাটা একবার দরকার দাদা। সিরিয়াস ব্যাপার আছে। নিচু গলায় খবর জানাল রতন বিশ্বকর্মা।

৫৩

পল অধিকারী ঝুঁকি নেবেন না বলে সমতলে নামার জন্য ভুটান সীমানা বরাবর পুবে হাঁটা দিয়েছিলেন। তারপর তিতি অরণ্যের মধ্যে দিয়ে গোপন পথ ধরে এসে হাজির হয়েছেন তোর্সার পশ্চিম পাড়ে। এইখানে অরণ্যের পরিচয় 'হোলাপাড়া ফরেস্ট'। এই অরণ্যেই অস্থায়ী ক্যাম্প পেতেছেন পল অধিকারী। তোর্সা পেরিয়ে ওপারে দক্ষিণ-পূর্ব বরাবর এগলে হাসিমারা। সোজা পুবে গেলে চিলাপাতা অরণ্য। সুরেশ কুমারের আসার কথা হাসিমারায়। সব ঠিকমতো চললে হোলাপাড়া ফরেস্টের এই ক্যাম্পেই তাঁকে নিয়ে আসবেন পল অধিকারী। মাঘ মাসের এই অরণ্য পাতা ঝরিয়ে কিঞ্চিৎ হালকা হয়ে আছে। তবুও পল অধিকারী বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছিলেন। পুলিশের খাতায় তিনি মৃত হলেও বিপদ কখন কোন দিক থেকে আসে, বলা কঠিন। কিন্তু এই অস্থায়ী ক্যাম্পে তাঁকে খুঁজে পাওয়ার মতো লোক পাওয়া খুবই শক্ত।

শীতের এই শুকনো অরণ্যে আগুন জ্বালাবার মতো বিপজ্জনক কিছু হয় না। পল অধিকারী পর্যাপ্ত শুকনো খাবার নিয়ে বেরিয়েছিলেন। সঙ্গে দু'জন অতি বিশ্বস্ত শাগরেদ। এরা পল অধিকারীকে নিরাপদে সুরেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করিয়ে সমতলে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এসেছে। দু'জনের একজন বেশ এগিয়ে থেকে পরিস্থিতি বুঝে মুখ দিয়ে পাখির ডাকের মতো তীক্ষ্ণ স্বরে সংকেত পাঠায়। দ্বিতীয়জন সেই সংকেতের উত্তর দেয় হুবহু একই সুরে। সংকেত পাঠাবার এই পদ্ধতি বহুকালের পুরনো। তিব্বতি সেনাদের সঙ্গে বহুকাল আগে যুদ্ধের দিনগুলিতে এইভাবে সংকেতের মাধ্যমে খবর আদানপ্রদান হত। তোর্সার ওপার থেকে হাসিমারা পর্যন্ত লোক এসে ঘাঁটি গেড়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে রিলে পদ্ধতিতে পাখির ডাকের সংকেত চলে যাবে হাসিমারার কাছাকাছি সেই গ্রামে, যেখানে মোবাইল টাওয়ার কাজ করে। বাকিটা ফোনেই হবে।

ক্যাম্পটা গাছপালার ডাল আর শুকনো পাতা দিয়ে দু'ঘণ্টার মধ্যে তৈরি করা হয়েছে। ব্যাটারি লাগানো এলইডি আলো আছে সঙ্গে। তবে খুব দরকার না হলে আলো জ্বালাবার নিয়ম নেই। তা ছাড়া শুক্লপক্ষ হিসেব করে বেরিয়েছেন পল অধিকারী। চাঁদের নরম মৃদু আলো তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। এমনিতে জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ার বিশেষ নেই। শীত বলে সাপেরাও চলে গিয়েছে গর্তে। বস্তুত, ঠান্ডা ছাড়া আর কোনও প্রতিপক্ষ নেই এই অরণ্যে। সন্ধে নাগাদ পেট ভরে চিঁড়ে আর ছাতু খেয়ে পল অধিকারী ঘুমাতে গেলেন। গভীর রাতে তিনি উঠবেন। জাগবেন সকাল পর্যন্ত। সেই সময়টায় তাঁর সঙ্গে থাকা শাগরেদটি বিশ্রাম নেবে। সুরেশ কুমার যদি প্ল্যানমাফিক কাজ সেরে ফেলতে পারেন, তবে আগামীকালই তাঁদের সাক্ষাৎ হওয়ার কথা। অবশ্য সে সাক্ষাৎ রাতের আগে হবে না।

কোথাও কোনও গণ্ডগোল হল না। রাত দেড়টা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে বেশ ঝরঝরে শরীর আর মন নিয়ে পল অধিকারী ক্যাম্পের বাইরে এসে বসলেন। জঙ্গি হওয়ার আগে থেকেই তিনি শেষ রাত থেকে ভোর পর্যন্ত জেগে থাকতে পছন্দ করতেন। এই সময় তাঁর মাথা খুব ভাল কাজ করে। তিনি ক্যাম্পের বাইরে এসে দেখলেন আবছা অন্ধকারে চারদিক ঝিম মেরে রয়েছে। আজ শুক্লা একাদশী। চাঁদ বেশ উজ্জ্বল। শুকনো শীতের হাওয়া চামড়া ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছিল শরীরে যেন। কান-মাথা ভাল করে গামছা দিয়ে পেঁচিয়ে শীত তাড়াবার জন্য একটা গুয়া সুপুরি মুখে দিয়ে চিবাতে শুরু করলেন তিনি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটা গরম ভাব শরীরে ছড়িয়ে পড়ায় তাঁর বেশ আরাম হতে লাগল। সামনেই একটা অশ্বত্থ গাছ ডালপালা

ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পল অধিকারী বানরের ক্ষিপ্রতায় গাছের ঝুরি ধরে একটা ডালে উঠে বসে কাণ্ডে হেলান দিলেন।

অনেক কিছু ভাবার আছে। সুরেশ কুমার ভালই টাকা দেবে বলে তাঁর ধারণা। অবশ্য প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য পল অধিকারী ছাড়া তাঁর গতি নেই। মনে হয় খুব বেশি দরাদরি করবে না। চিন থেকে দু'-তিনজনের একটা দল নেপাল হয়ে শিলিগুড়িতে এসে পল অধিকারীর সঙ্গে লাল চন্দন পাওয়া নিয়ে চুক্তি করবে। কাঠের বিনিময়ে অস্ত্র আর বিস্ফোরক পাবেন পল অধিকারী। নর্থ-ইস্টের খাপলাং জঙ্গিদের কাছ থেকেও কিছু ভারী অস্ত্র আসা উচিত। সব কিছু প্ল্যানমাফিক চললে আগামী ছ'মাসের মধ্যে ডুয়ার্সের কোথাও একটা বড় নাশকতা ঘটানোর কাজ খুব সহজেই সেরে ফেলা যাবে বলে সিদ্ধান্তে এসেছেন তিনি। অবশ্য এই জগতে নিশ্চিন্ত বলে কিছু নেই। একটা বিস্ফোরণ ঘটানো কঠিন কিছু নয়, কঠিন হল তার আগের ও পরের সময়টা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এখন প্রায়ই ডুয়ার্সে আসছেন। তাঁর কনভয়ে আঘাত করার ব্যাপারটা এখনও পল অধিকারীর মাথায় নেই। কিন্তু তাঁর সফরের সময় একটা ঘটনা ঘটাতে পারলে মাইলেজ পাওয়া নিয়ে কোনও সংশয় থাকে না।

ভাবনায় নিমগ্ন মানুষের সময় কোথা দিয়ে চলে যায়, তার থই পাওয়া কঠিন। গাছের ডালে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ পল অধিকারীর মনে হল, আবছা অন্ধকারটা যেন পাতলা হতে শুরু করেছে। তিনি সোজা হয়ে বসে উপরের দিকে তাকালেন। চোখে পড়ল ছায়া আকাশ আর সিলুটের মতো ডালপালা, পাতাপত্রের ছবি। তিনি বুঝলেন ভোর আসন্ন। দ্রুতপায়ে গাছ থেকে নেমে তিনি ক্যাম্পের ভিতরে এসে প্রবল শীতের মধ্যেও অনেকটা জল খেলেন। কিছু খাওয়ার কথাও মনে হল তাঁর। তখনই শীতের আবহাওয়া ভেদ করে তাঁর কানে ভেসে এল একটা চেনা ডাক— টি ইইই টি টি টি!

৫৪

মিরিকের বিখ্যাত লেকের সামনে মনামি আর সুষমা চুপচাপ বসে ছিল। দিনটা রৌদ্রকরোজ্জ্বল। ভোর থাকতেই গাড়ি ভাড়া করে দু'জন শিলিগুড়ি থেকে বেরিয়েছিল। নিপাট ভ্রমণের জন্য। অনেকদিন পর আজ বাড়িতে সত্যি কথা বলে বেরিয়েছে মনামি। মা-বাবার আপত্তি করার কোনও কারণ ছিল না। তারা কেবল বলেছে সন্ধ্যার আগেই শিলিগুড়িতে নেমে আসতে। মিরিকে আজ পর্যটকদের দল নেমেছে। রঙিন পোশাক পরা হাসিখুশি মানুষের দল এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হুল্লোড়ে মেতেছে সেখানে। মনামি আর সুষমা অবশ্য শান্ত মনে লেকের দিকে অলস চোখে তাকিয়ে থেকে বাদাম খাচ্ছিল একটা-দুটো করে।

গত পরশু 'ঋষিকাম' ছবির প্রথম দফার শুটিং হয়ে গিয়েছে। সেবক সেতু পেরিয়ে ওদলাবাড়ি যাওয়ার পথে চমৎকার একটা বাংলো টাইপের বাড়ি আছে। অনেকটা জায়গা নিয়ে। সে বাড়ির পিছনে গাছপালার ফাঁকে আছে একটা বাঁশ ও খড়ের তৈরি দু'কামরার কটেজ। নতুন তৈরি হয়েছে বাংলোটা। আগামী মার্চে মন্ত্রী এসে উদ্‌বোধন করলে তা খুলে দেওয়া হবে পর্যটকদের জন্য। আপাতত দিন সাতেকের জন্য সেটা ভাড়া করেছে সুরেশ কুমার। 'ঋষিকাম' ছাড়াও আরও কয়েকটা ভিডিয়োর শুটিং হবে সেখানে। সুরজ কুমার সাত দিনে গোটা সাতেক ভিডিয়ো তুলবে। এর মধ্যে তিন দিন লাগবে স্রেফ 'ঋষিকাম'-এর জন্য। সে ছাড়া তার টিমে লোক মোটে দু'জন। পরিচালক একজন মাঝবয়সি মহিলা। উত্তরপ্রদেশের মেয়ে। নাম গীতা। গত শতকের নয়ের দশকে তিনি ছিলেন হিন্দি ব্লু ফিল্মের খ্যাতনামা নায়িকা। এখনও শরীরের বাঁধন চমৎকার। দ্বিতীয় লোকটি মারাঠি। তিনিও মাঝবয়সি। মৃদুভাষী এবং মুখে সবসময় একটা মোলায়েম হাসি ঝুলে থাকে। বিনোদ নামক এই লোকটি সারাদিনে তিন ছিলিম গাঁজা খান বলে চোখ দুটো লাল হয়ে থাকে। তাই সবসময় সানগ্লাস পরেন।

বিনোদবাবু একাধারে সহকারী এবং মেকআপ আর্টিস্ট। 'ঋষিকাম'-এর ঋষিমশাই মুম্বইয়ের ছেলে। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। দুরন্ত শরীর। পেশিবহুল সিক্স প্যাক। সিংহের মতো সরু কোমর। ঘাড় পর্যন্ত চুল। চোখ দুটো ভাসা ভাসা। তাকে নকল চুল আর দাড়ি পরে ঋষি সাজতে হয়েছে। কোমরে বাঘছাল পরে সে বসে থাকবে ধ্যানে। আর মনামি তার ধ্যান ভাঙিয়ে নিয়ে যাবে কুটিরের ভিতরে। ছবিতে মোট পাঁচটা সিকোয়েন্স। তার মধ্যে দু'টির কাজ হয়েছে পরশু। প্রথম সিকোয়েন্সে মনামি ঋষিমশায়ের অঙ্গমার্জনা করবে। এর ফলে একটু বিচলিত হবেন ঋষিমশাই। দ্বিতীয় সিকোয়েন্সে চুম্বন ও লেহন। অরণ্যকন্যা মনামি এই দুটো সিকোয়েন্সে অবশ্য বস্ত্র ত্যাগ করেনি। তবে তার জন্য বিশেষ কস্টিউম বানানো হয়েছে। দেখলে মনে হয় লতাপাতার পোশাক এবং অবশ্যই সে পোশাক বেশ সংক্ষিপ্ত। বাকি তিনটি সিকোয়েন্সে ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ হবে সংগম পর্ব।

বাংলোটা বেশ উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তবুও কুটিরের সামনের দিকটা পলিথিন দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। গীতা ম্যাডাম শট নেওয়ার ব্যাপারে বেশ খুঁতখুঁতে। পনেরো মিনিট করে দু'টি সিকোয়েন্স তুলতে তাঁর সময় লেগেছে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। কাজের শেষে অবশ্য তিনি তৃপ্ত মুখে বলেছেন, 'ওয়েল ডান।' সুরেশ কুমার অবশ্য কাজ শুরু হতেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। মূল বাংলোর ঘরে দু'জন পাহারাদার মজুত ছিল। বাকি যে ভিডিয়োর কাজ কাজ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে, সেগুলো অবশ্য বাংলোর ঘরেই হবে।

যাওয়ার আগে সুরেশ কুমারের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা হয়েছিল মনামির। নবীন রাইয়ের বদলে সে কীভাবে এই প্রজেক্টের কাজ করছে— এই প্রশ্নের জবাবে সুরেশ কুমার মৃদু হেসেছেন। বলেছেন, 'ছেড়ে দিন না। কাজ হলেই হল।' তারপরই বলেছেন, "'ঋষিকাম' রিলিজ হওয়ার পর দেখবেন আপনার ভ্যালু কেমন বেড়ে যায় ম্যাডাম! তবে আপনাকে আমরা ছাড়ছি না। আমাদের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক পরের প্রজেক্ট ডিজাইন করে ফেলেছে— 'শকুন্তলা'। আপনি স্রেফ দু'দিন বাইরে থাকার পারমিশন নিয়ে নেবেন বাড়ি থেকে। ডুয়ার্সের একটা ফরেস্টের কোর এরিয়ায় শুট করব।'

একটা নেপালি যুবক অদ্ভুত সুরে বাঁশি বাজাচ্ছিল। মনামি তাকিয়ে ছিল ছেলেটার দিকে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, একটি মেয়ে তাদের দিকেই হনহন করে এগিয়ে আসছে। সুষমা মেয়েটির এগিয়ে আসাটা লক্ষ করে খুব অবাক হয়ে অস্ফুটে বলে উঠল, 'মাই গড! এ তো মুনমুন!' মনামি লক্ষ করল যে সুষমার চোখে-মুখে একটা খুশির ভাব ফুটে উঠেছে।

মনামি দেখল মেয়েটির চোখে-মুখে বিষাদের ছায়া। সে আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল সুষমার দিকে। তারপর ধরা গলায় বলল, 'বিজু প্রসাদকে মেরে ফেলেছে। বিজুজি মর গয়া!'

তারপরেই কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে। মনামির ধারণা ছিল, সুষমা অতি কঠিন স্বভাবের মেয়ে। কিন্তু এখন সে অবাক হয়ে দেখল, সেই সুষমার চোখও একটু একটু করে ভরে উঠছে জলে। যে মেয়ে জীবনের পথ হেঁটে আসছে সরু সুতোর উপর দিয়ে, অন্ধকার জগতের দ্বার যে মেয়ে খুলে এসেছে অবহেলায় আর অনায়াসে, সে মেয়ে একটি মৃত্যুসংবাদে এভাবে কেঁদে উঠবে তা কল্পনাতীত ছিল মনামির ধারণায়।

কিন্তু সুষমা সামলে নিয়েছে। মেয়েটিকে যত্ন করে বসিয়ে সে হিসহিসে স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কে মেরেছে বিজুজিকে? তুই এখানে কী করছিলি? এতদিন যোগাযোগ রাখিসনি কেন?'

সামনে রৌদ্রকরোজ্জ্বল মিরিকের লেকের ধারে এখন রঙিন পর্যটকদের উল্লাস।

(ক্রমশ)

ছবিই যখন শেষ কথা বলে

প্রথাগত আঁকা শেখা যাকে বলে তা নানা কারণে হয়ে ওঠেনি সেভাবে, যেটুকু হয়েছিল তাও পড়াশোনার চাপে একদিন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মনের গভীরে বাস করা সেই শিল্পী-মনকে কি আদৌ বেঁধে রাখা যায়? ভিতর ভিতর একটা খোঁজ চলতেই থাকে। আর খুঁজতে খুঁজতে নিজেকে জানা, জেনে আবার ভাঙা, গড়া—মানুষটিকে কোথায় যেন একটু স্বতন্ত্র করে তোলে। এমনই একজন শিল্পী শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়, নিবাস ডাঙাপাড়া, জলপাইগুড়ি। বর্তমান উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলে পিএইচ ডি-র কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে জলপাইগুড়ির পি ডি কলেজের অতিথি অধ্যাপক এই শিল্পী ছবির জগতে ধীরে ধীরে নিজের জায়গা পাকা করে নিচ্ছেন নিজের প্রতিভার জোরেই। ভূগোল নিয়ে পড়তে পড়তে প্রকৃতি এবং মানুষকে দেখার একটা অন্যরকম চোখ তৈরি হয়ে গিয়েছিল সহজেই। সরাসরি আর্ট কলেজে ভরতি না হয়েও আর্ট কলেজের যে নির্দিষ্ট কিছু শেখানোর পদ্ধতি আছে তা ঘরে বসেই আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন এই শিল্পী। গাইড বলতে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির বই। আর্ট কলেজের কায়দায় নিজেকে শিক্ষিত করতে কলকাতায় না গিয়ে নিজের জায়গাতেই কাজ করে গিয়েছেন তিনি। শিল্পীর নিজের কথায়ই তার প্রমাণ মিলল—'হিউম্যান ফিগার স্টাডি করার জন্য শিয়ালদাও যা, এনজেপি-ও তা-ই।'

সামাজিক ভূগোল নিয়ে কাজ করতে করতে স্বভাবতই তাঁর ছবিতে ফুটে ওঠে খুব কাছ থেকে দেখা নারীর কথা, নারীর গল্প। মুহূর্তগুলোকে ধরে রাখাই বেশি পছন্দ এই শিল্পীর। তাই তো শুধু ক্যানভাসে রং-তুলির আঁচড়ে নয়, তাঁর প্যাশন হয়ে উঠেছে 'ডিজিটাল পেইন্টিং'। রাস্তায় চলতে চলতে ক্যামেরায় বা সাধারণ মোবাইলে তুলে রাখা হঠাৎ ছুঁয়ে যাওয়া কিছু মুহূর্ত পরবর্তীকালে হয় একেকটি সফল ছবি। কোনও একটি নির্দিষ্ট মাধ্যম বন্দি না থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে চলতে থাকে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা। ২০০৭ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত কলকাতা-সহ শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির নানা চিত্রপ্রদর্শনীতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে সহজেই পায়ের নিচের মাটিটাকে শক্ত করে তুলেছেন তিনি। প্রশংসিত হয়েছে তাঁর কাজ।

২০১২-য় জলপাইগুড়ির বাবুপাড়ার ১০১ বছরের ঐতিহ্য বহনকারী দুর্গা পুজোর মণ্ডপকে সাজিয়ে তুলেছিলেন নিজস্ব চিন্তাভাবনায়, যার নাম ছিল '...এবং নারী, রং তুলি ও ক্যানভাস-এ'। প্রায় ৫০ মিটার ক্যানভাসকে সাজিয়ে তোলার কাজটি সহজ ছিল না মোটেও। ছবি সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মশালায় নিয়মিত যোগদান করে এখনও কাজ শেখেন তিনি। ২০২৫-এ আচমকাই সুযোগ আসে 'অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস'-এ এককভাবে প্রদর্শনী করার। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই ডাককে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি কিছুতেই। শুরু হয় আরেকটা লড়াই। অবশেষে বেশ কিছু মানুষের অনুপ্রেরণায় জন্ম নিল শ্রেয়সীর স্বপ্ন 'A Cappella', প্রথম একক চিত্রপ্রদর্শনী, উদ্‌বোধন করলেন ঊর্মিমালা বসু এবং ঈলিনা বণিক। এলেন আরও কিছু গুণী মানুষ, জলপাইগুড়ি থেকেও ছুটে গেলেন কেউ কেউ। শিল্পীর কাজ প্রশংসিত হল। ছবির ইতিহাসে জুড়ে গেল এক শ্রেয়সীর নাম। রং-তুলির বাইরে গিয়ে একটু অন্যরকম ভাবনা থেকে করা হল 'Installation Art'-এর কাজ।

একটা ছবি, যা প্রতিদিন একটু একটু করে পরিবর্তিত হতে হতে অবশেষে সম্পূর্ণ এক অন্যরকম রূপ পায়, যেখানে দর্শকও হয়ে ওঠেন ছবির বিষয়বস্তু। শ্রেয়সীর ছবিগুলো দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, যেন সেগুলি একেকটি কবিতা। হ্যাঁ, কখনও কখনও কবিতা থেকেও জন্ম নেয় ওঁর এই ছবিগুলি। আবার কখনও ছবিগুলিই হয়ে ওঠে কবিতা। যখন আঁকা সম্ভব হয়ে ওঠে না, ডায়েরির পাতা ভরতে থাকেন কবিতা দিয়ে, পরে যেগুলো থেকে অসাধারণ সব কাজ হয়েছে। অবসরে প্রচুর স্কেচ করেন এই শিল্পী। সেগুলো দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। বেশ কিছু পুরস্কারও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। অল বেঙ্গল এডিটরস' অ্যান্ড জার্নালিস্টস' অ্যাসোসিয়েশন থেকে সেরা ছবি, ন্যাশনাল আর্ট কম্পিটিশন থেকে দ্বিতীয় পুরস্কার, অল ইন্ডিয়া ক্যামেল কালার কনটেস্ট-এ বিজয়ী এই শিল্পী এখন কাজ করছেন তাঁর পরবর্তী প্রদর্শনীর জন্য। উত্তরবঙ্গে আর্ট কলেজের অভাব, নেই ভাল আর্ট গ্যালারি, তা সত্ত্বেও জন্মস্থানের মানুষদের নিজের কাজ দেখানোর ইচ্ছে থেকেই এখানেই নিজের প্রদর্শনী করতে চান তিনি। তবে নিজের কাজের জন্য যা যা করণীয়, তাতে এতটুকু গাফিলতি করতে নারাজ শ্রেয়সী। সমস্ত উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে থাকা নানা ছবি আর সেইসব ছবির সম্পদ নিয়ে সমৃদ্ধ এই শিল্পীর আগামী জুড়ে জড়িয়ে থাকা রঙিন ক্যানভাসই বলে দেয়, আরও কত রং বাকি থেকে গিয়েছে, আরও কত কী বলা বাকি রয়ে গিয়েছে, তা শ্রেয়সী দিতে বদ্ধপরিকর। আমরাও তাকিয়ে থাকি তাঁর সেই রংদার আগামীর দিকে।

শাঁওলি দে

লইট্যা মাছের ঝুরি

উপকরণ- লইট্যা বা শাটি মাছ, সাদা জিরে, পেঁয়াজ, রশুন, আদা, জিরে বাটা, কাঁচা লংকা।

প্রণালী- প্রথমে লইট্যা মাছগুলোর মাথা বাদ দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিন। এর পর কড়াইতে ভাল করে তেল গরম করে মাছগুলো ভেজে তুলুন। একটা পাত্রে মাছগুলোকে নামিয়ে ঠান্ডা করে মাছের কাঁটাগুলো বার করে নিন। আবার কড়াইতে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুচি, রশুন কুচি, আদা কুচি দিয়ে ভাল করে ভেজে নিন। ওগুলো হালকা বাদামি রঙের হয়ে এলে তাতে জিরে বাটা, পেঁয়াজ বাটা ও কাঁচা লংকা দিয়ে ভাল করে কষান। কষানো হয়ে গেলে তার মধ্যে মাছগুলো ভেঙে দিয়ে দিন।

এর পর সমগ্র উপাদানটি নাড়তে থাকুন, যতক্ষণ না পর্যন্ত মাছ মশলার সঙ্গে মেশে। কষতে কষতে মাছ শুকনো হয়ে এলে ধনেপাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে খেলে এর স্বাদ সত্যিই লোভনীয়।

সোমা দে সরকার,
মেলার মাঠ, হলদিবাড়ি

শখের বাগান

শোভা বিলাবে নয়নতারা

নয়নতারা আমাদের অতিপরিচিত ফুল। খুব কষ্টসহিষ্ণু ফুলগাছ। খুব একটা যত্নের প্রয়োজন হয় না। আপনার বাড়ির সামনে যদি সামান্য জায়গা থাকে, লাইন করে লাগান। ফুল ফুটলে দারুণ লাগবে। নয়নতারা সারা বছরই ফোটে। টবেও লাগাতে পারেন। সাধারণ দোআঁশ মাটি হলেই চলে। মাটিতে হলে সার দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। টবে হলে চার-পাঁচ মাস পর দু'-তিন মুঠো গোবর সার টবপ্রতি দিলে ফুলের পরিমাণ বেশি হবে, বেশি দিন ফুটবেও। সাধারণত আমরা চারপাশে গোলাপি আর সাদা রঙের নয়নতারা দেখতে পাই। এ ছাড়াও এখন পাওয়া যায় বেগুনি, হালকা বেগুনি, নীল (ছোট ও বড় আকারের), লাল, লাল-সাদা। তবে এগুলো একটু যত্ন করতে হয়। সাধারণত বীজ থেকেই চারা হয়। রং মিলিয়ে কেয়ারি করে লাগালে সুন্দর হয়ে উঠবে আপনার বাগান। টবের গাছের মাথা খুঁটে দিলে ঝোপালো হবে, ফুলও ফুটবে প্রচুর সারা বছর ধরে। খাটুনি কিন্তু প্রায় নেই। শুধু টবের মাটি শুকিয়ে গেলে মাটি ভিজিয়ে একবার জল দিন। ব্যাস।

নিঝুম ঠাকুর

ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াবার ক্রিম মাখছেন? সাবধান! ওতে 'মার্কারি' নেই তো?

ডাক্তারের ড্রয়ার্স

রাতে শুতে যাওয়ার আগে বা দিনের বেলায় বেরবার আগে আয়নায় দেখে যদি মনে হয়, আপনার মুখের ত্বক বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন কুঁচকে যাচ্ছে, তবে মন খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। বন্ধুরা কিংবা প্রতিবেশী শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছ থেকে পেলেন এমন এক আশ্চর্য ক্রিমের সন্ধান, যা মাখলেই চামড়া থাকবে টানটান, উজ্জ্বলতায় ভরা। খবরের কাগজ বা টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখে ফিরে পেতে পারেন মনের জোর। কিন্তু সেইসব ক্রিম ব্যবহার করবার আগে একটু সাবধান হতে হবে বইকি। কেনা বা ব্যবহারের

আগে দেখে নিতে হবে, সেই ক্রিমে ব্যবহৃত উপাদানগুলির মধ্যে মার্কিউরাস ক্লোরাইড বা ক্যালোমেল বা মার্কিউরিয়ো জাতীয় কোনও নাম আছে কি না। তাহলেই সাবধান! বুঝতে হবে সেই ক্রিমের মধ্যে 'মার্কারি' বা পারদ রয়েছে, যা ত্বক ও শরীরের পক্ষে যথেষ্ট বিপজ্জনক। যে তোয়ালেতে মুখ মুখছেন, তার মাধ্যমে সেই মার্কারি চলে যেতে পারে পরিবারের অন্যান্যদের শরীরে। বিশেষ করে

ছোটদের শরীরের তা যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে, মস্তিষ্কের বৃদ্ধি বা স্নায়ুর কাজকর্ম ব্যাহত হতে পারে। গর্ভবতী মহিলার ক্ষেত্রে গর্ভের সন্তানের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি, পারদ ত্বকের পক্ষেও যথেষ্ট ক্ষতিকারক। অতএব ব্যবহারের আগে সতর্ক থাকুন। যেসব ক্রিমের কৌটোয় উপাদান কী কী, তার কোনও উল্লেখ থাকে না, সেগুলি থেকেও দূরে থাকুন।

পোশাকের দোকানে ট্রায়াল দিতে গিয়ে মন খারাপ, ফিট চেহারা বেঢপ হয়ে যাচ্ছে বলে ?

সেটাই তো স্বাভাবিক। এদ্দিন যে কোনও পোশাক পরে বেরলেই তো যুবা-বৃদ্ধ-মাঝবয়সি সব টেরিয়ে টেরিয়ে দেখত, বন্ধুরা প্রশংসা বা হিংসেয় বলত, ফিগারটা এমন চমৎকার রেখেছিস কী করে রে? সেই গর্বে, অহংকারে দু'ফোঁটা গোচোনা পড়ে গেল এবার পোশাকের দোকানের ট্রায়াল রুমে গিয়ে। দুর্দান্ত একটা ড্রেস কিছুতেই যে মানাচ্ছে না। পেটটা কেমন ফুলে উঠেছে, হাত দুটোও কেমন গোদা গোদা লাগছে।

বয়স বাড়তে থাকলে ওজন বাড়ার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। আর সারাদিন বসে বসে কাজকর্ম করলে তো কথাই নেই। এবার নজর দিতেই হবে শরীরের দিকে। খাদ্যতালিকা থেকে চায়ে চিনি, মিষ্টি, শিঙাড়া, তেলেভাজা, বাটার-চিজ, রাত ন'টার পরে ডিনার বাদ দিতে হবে। রোজ তিন লিটার জল ও সপ্তাহে পাঁচ দিন শাকসবজি এবং সেই সঙ্গে আধ ঘণ্টা শারীরিক কসরত, কিলোমিটার দুয়েক হাঁটা বা সাইকেল চালানো রোজকার রুটিনে ঢুকিয়ে ফেলতে হবে যত দ্রুত সম্ভব। যোগব্যায়াম এ সময় ভীষণ কাজে দেবে। না করতে পারলে উপায় নেই। বেঢপ হতে হতে হারিয়ে যেতে হবে আগামী বছর উৎসবের আগেই।

ডা. নিকিতা রাই

ভাবনা বাগান

মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

আশ্বিন মাসের খর রৌদ্র। আকাশের রং ঘন নীল। তাতে সাদা থোকা থোকা পুঞ্জ মেঘ। সোনালি আলোয় কীরকম একটা মন খারাপ আর হারানো দিনের কী যেন বিষণ্ণতা। চায়ের কাপ হাতে ছোট্ট বারান্দার এক কোণে গন্ধরাজ আর মাধবীলতার আলাদা আলাদা সবুজের গন্ধ নিচ্ছি। টিং টং। ওই পারুদি এল। ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়া যায়— তার মানে সাড়ে সাত। হাঁপাচ্ছে। মাঝবয়সি দোহারা তামাটে চেহারাটায় অনেক আঁকিবুকি। সাইকেল চালিয়ে প্রায় কয়েক কিলোমিটার দূর ওই তিস্তার চর থেকে আসে পার্বতীদি। এর মধ্যেই আরেক বাড়ি কাজ সেরে ফেলেছে।

—উফফ... পারুদি, আজ রবিবারও তোমার এত তাড়া?

এক গাল হেসে, 'কী যে কস বউ! মাটি কাটানের একশো দিনের কাজ যাবার লাগবে যে! তারপর আরও দুই বাসার কাজ।'

—বলো কী? এই ঠা ঠা রোদে পারবে তুমি?

—পারতে লাগবে গো। ঘরে ক'টা এস্টা (এক্সট্রা) মুখ এখন, জানস না? থাম দিকি এখুন।

—ও পারুদি, তোমাদের বাড়ির পাশে অনেক কাশফুল ফুটেছে না? এনে দেবে আমাকে?

আঁচলটা গাছ-কোমর করতে করতে বলে, 'কী করবা ওই জঙ্গলগুলান তুমি? খোঁপায় বাঁধবা নাকি? হি হি হি...'

আমি আলতো টোকায় পারুদির খোঁপা খুলে দিই। কোমর অবধি কুচকুচে কালো চুল ঝাঁপিয়ে পড়ে।

—ইস্সস... কী মাখো গো মাথায়? একটাও চুল পাকেনি তোমার? কী সুন্দর চুল গো!

—দ্যাকো কথা। দিলি তো চুলগুলান খুলে? কয়লা মাখি গো— যেমন পোড়া কপাল আমার। সর সর...। ধুলা পারা দিস না তো।

সোফায় পা গুটিয়ে বসি। খবরের কাগজজোড়া দশভুজার আবাহনবার্তা। পদ্মলোচনা চম্পকবর্ণা দেবীমূর্তির দিক থেকে অন্যমনস্ক চোখ পারুদির দিকে। পার্বতী বর্মন। তামাটে মেচেতা পড়া মুখটায়, সামান্য চাপা নাকে ঝুটো পাথরের নাকফুলে, অগোছালো হাতখোঁপায়, আমারই দেওয়া একটা পুরনো সুতির শাড়িতে কী লাবণ্যময়ী। মুখে সবসময় একটা হাসি। বর সদাশিব নামে ও গাঁজাসেবনে ভোলানাথ হলেও তার পত্নীপ্রেমের নিদর্শন বলতে পারুদির শরীরে কালশিটে আর বিড়ির ছেঁকার ফোসকা ছাড়া অন্য কোথাও প্রকাশ পায় না। অনেকদিন অবধি জানতাম পারুদির চার ছেলেমেয়ে। পরে কথায় কথায় শুনেছি, দুই ছেলেই কুড়িতে পা রাখার আগেই বিয়ে করে বউ ঘরে তুলেছে। —'মেয়েগুলান তো এখন আমারই, নাকি? বল তো বউ?' অবাক আর মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিলাম পড়াশোনা না-জানা এই মাতৃমূর্তির দিকে। ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছিলাম, 'ও, আর আমাকে মেয়ে বলা যায় না?' —'এ মা, কী কও?' জিব কেটেছিল পারুদি, 'তোর কত্তারে দাদা কই যে! অমন নামী মানুষটার বউ তুই যে গো, তার উপর আবার দিদিমুনি— বউদিদি তুই আমার।'

> 'না গো, সোয়ামি আমার মানুষটা ভাল। তবে নেশা করলে হুঁশ থাকে না। আর শরীলটা ভাল না তো। তাই আমি কিছু করতে দিই না।'

—তোমার বাড়ির পুরুষগুলো কী করে গো? সারাদিন এত খাটো তুমি?

ঘর মুছতে মুছতে পারুদি বলে, 'না গো, সোয়ামি আমার মানুষটা ভাল। তবে নেশা করলে হুঁশ থাকে না। আর শরীলটা ভাল না তো। তাই আমি কিছু করতে দিই না। আর বেটাগুলান টুকটাক যা কামাই করে, তাতে ওদের বউদের শখ-আহ্লাদ, ওদের মোবাইল— এগুলোতেই যায়। আমি যদ্দিন কাজ করব, ওদের চিন্তা করতে হবে না— বলে দিচ্ছি। ছোট বিটিটা (ছোট বউ) কাজ

দশ হাতে আগলে রাখা সংসারটি ফেলে সত্যিকারের কৈলাসের দিকে যখন শিবানী চলে গেল, সে দিন মহালয়া। দেবীপক্ষের সূচনায় সে দিনও এরকম সোনালি আলোয় ভাসছিল চরাচর। শহরের পূজামণ্ডপগুলো থেকে আড়ালে এই মানবীজন্মটুকুও ঠিকঠাক উপভোগ করতে না পারা, দৈবী মহিমাহীন মুখগুলোর ঘাম-তেলের ভিতর জ্বলজ্বল করে ওঠে অদৃশ্য ত্রিনয়ন।

করতে চায়। আমি বারণ করেছি।'

আমি জানি, চার বাড়ি কাজ করে পারুদি যে হাজার চারেক আয় করে তা সবটাই ছেলেরা আর বর কেড়ে নেয়। কোনও দিন কিছু ভাল খাবার হাতে ধরে দিলে তার আদরের বিটিগুলানের জন্য গুছিয়ে নিয়ে যায়। দারিদ্র্যাসুরের সঙ্গে, নেশাসুরের সঙ্গে 'রণং দেহি' হয়ে লড়াই করে রাতদিন। আর বুক দিয়ে আগলে রাখে সংসার নামক অভ্যেসটাকে, যেটাকে ও খুব আপন বলেই জানে। গত মাসে খবর না দিয়ে হঠাৎ চার দিন পাত্তা নেই তার। ভাবলাম, নিশ্চয়ই জ্বর বাধিয়েছে! যেভাবে ঝড়বৃষ্টি মাথায় সাইকেল চালিয়ে ঘুরে বেড়ায়! পাঁচ দিনের মাথায় সকাল সাড়ে সাতে কাঁচুমাচু হাজির—

—ধম্মবউটা মইরে গেল রে আমার।

—সে আবার কে গো?

জানা গেল, গ্রামের সম্পর্কে এক দাদার ছেলেকে সে ধম্মছেলে মানে— যেহেতু শিশুবেলায় সে অনাথ হয়েছিল। এখন সেই ছেলে ভিন রাজ্যে কাজে গিয়েছে। তার বউ আর তিনটি শিশুর খোঁজখবর দেখভাল এই পারুদিই করে থাকে। তা সেই হতভাগিনী, অর্থাৎ পারুদির 'ধম্মবউ'— সাত, পাঁচ, চার বছরের তিনটি বাচ্চা রেখে জ্বরে মারা গিয়েছে। ছেলেটি এসে পৌঁছাতে পারেনি, তাই বাচ্চাগুলোকে পারুদিই নিয়ে এসেছে, যতদিন না তাদের কোনও ব্যবস্থা হয়। ফলস্বরূপ তার বাড়ির লোকের আপত্তিতে সে বলেছে, সে কারও রোজগারে খায় না! এরাই এখন সেই 'এস্টা মুখ সংসারে'। বোঝো কাণ্ড! অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ভাবছিলাম— তবে যে আমরা ভদ্দরলোকেরা, শিক্ষিত সংস্কৃতিবান বাবুসমাজ ভাষণ দিয়ে থাকি মানবিকতার অপমৃত্যু নিয়ে, সে কোন অধিকারে?

—দরজাখান দিয়ে বোসো গো বউ— পার্বতীদির কাজ সারা।

বেরিয়ে যায় সাইকেলের প্যাডেল ঘুরিয়ে। আর এই দেবীপক্ষে আমার মনে পড়ে যায় আর-এক দশভুজার কথা।

কী আশ্চর্য! তার নাম ছিল শিবানী! আগে খেয়াল করিনি তো!

ভয়ানক অসুস্থতায় শয্যাশায়ী আর মানসিক বিপর্যয়ের দিনগুলোয় এসেছিল শিবানীমাসি। ভাল ভাষায় সহায়িকা, আর চলতি কথায় আয়ার কাজ করতে। সারাদিন আমার মাথার কাছে বসে হাত বুলিয়ে দিত চুলে, হাতের আঙুল টেনে টেনে বকবক করে কী যে বলত আর না বলত! ছোট্টখাট্ট, খয়াটে, গাল ভাঙা মিশমিশে কালো প্রৌঢ়া মানুষটা যেন উড়ে উড়ে হাঁটত। পৃথিবীর হেন বিষয় নেই, যা নিয়ে তার বক্তব্য নেই। আমার ছেলে আর তার বাবা সারাক্ষণ নানা কিছু নিয়ে ঠাট্টা করত ওর সঙ্গে, আর সেগুলো সব বিশ্বাস করত মানুষটা। যেমন হয়ত বলল, 'কী গো মাসি, কাল তুমি নাকি বিউটি পার্লার গিয়েছিলে শুনলাম।' অমনি দু'গালে হাত রেখে জিব কেটে চিল চিৎকার, 'মা কালীর দিব্যি বলছি দাদা, আমি পার্লার যাই না। আমার ইস্কিন এরকমই সুন্দর।' তারপর থেকে ওকে 'সুন্দরী' বলে ডাকা হত—আর সে কী লজ্জা তার! নিজের বয়সের যা হিসেব ও দিত, তাতে মনে হত, ওর জন্মই হয়েছিল ওর ছেলের জন্মের পর। সরলতা শব্দটা অবয়ব নিলে বুঝি এরকমই দেখতে হত সে!

শিবানীমাসির কাছে শুনেছিলাম তার জীবনের গল্প। কোন শিশুকালে পালিয়ে এসেছিল এক মাঝবয়সি পুরুষের প্রেমে, শুধু তার রূপ দেখে। পরে জানতে পারে সেই বিবাহিত মানুষটির পূর্ব সংসার ও একাধিক সন্তানের কথা, যারা তার থেকেও বয়সে বড়। মাত্র দু'বছরের মাথায় এক ছেলে কোলে বিধবা হয় শিবানী।

—জানো বউদি, অনেকরকম কাজ করছি। শুধু আমার বাপির মুখের দিকে চেয়ে। সারারাত দা হাতে করে বসে থাকতাম বদ লোকের উৎপাতে। বাপিরে লেখাপড়া শিখাইছি, বড় করছি, বিয়া দিছি— সব এই কাজ করে। বাপির বউ আমার লক্ষ্মী ঠাকুরের মতো সুন্দর। নাতিন দুটো আমাকে খুব ভালবাসে গো। বাপি আমার কত রোজগার করে আসামে থেকে। আমার কাজের অভ্যাস, তাই করি গো বউদি।

—পরে আমি সুস্থ হয়ে ওঠায় অন্য বাড়ি কাজ খুঁজে দিয়েছিলাম। তারপর আবারও অন্য কোথাও। মাঝে মাঝে আসত তবু— তোমার জন্য মনটা টানতেছিল গো বউদি।

—এ কী গো? এত চেহারা খারাপ হয়েছে তোমার মাসি? কাশি হয়েছে তো দেখছি!

—না না! আমি বাসকপাতা খাই রোজ। আমার কাশি হবে ক্যান?

—অমনি সবজান্তাগিরি শুরু।

—তুমি ঠিক আছ বউদি? বিশ্বাস করো, এই তোমাকে ছুঁয়ে বলতেছি— রোজ ঠাকুররে কই, আমার এমন ভালমানুষ বউদিটারে রক্ষা কোরো ঠাকুর! জানো, আমার বউ আমারে একটা চাদর কিনে দিয়েছে। বাপি তো বলতেছে, এবার আমাকে কামাখ্যা নিয়ে যাবে।

চলতেই থাকে বকবকানি আর আমি অবাক হয়ে ভাবি, মাত্র তিন মাস আমার কাছে থাকা মানুষটার এমন স্নেহ, এত উদ্‌বেগ আমার জন্য? বুকের ভিতরটা ভিজে যায়।

সারাক্ষণ শুধু ছেলে-বউয়ের উচ্চকিত প্রশংসা করা শিবানীমাসি কখনও বলেনি যে, তার সেই সুন্দরী বউমা পালিয়ে গিয়েছে বাচ্চা দুটোকে ফেলে রেখে। বলেনি, ছেলে তাকে নিষ্ঠুর প্রহার করে। বলেনি, মাতাল জুয়াড়ি ছেলের নিয়মিত তার ট্রাঙ্ক ভেঙে টাকা চুরি করে নেবার কথা। বলেনি, বাচ্চা দুটোর জন্য তার এই অশক্ত শরীরে কাজ করে বেড়ানো। জানলাম অনেক পরে, গত বছর— যখন খবর পেলাম শিবানীমাসি মরণাপন্ন। হাসপাতালের মেঝেতে পড়ে থাকা মানুষটার কঙ্কালের মতো শরীরটা কর্কট রোগে ততদিনে পচে-গলে এসেছে। চোখের কোটর থেকে জল গড়িয়ে পড়ে কেবল। হাতের পাতা দুটো চেপে ধরে বাক্‌রুদ্ধ মানুষটা কী বলতে চেয়েছিল জানি না। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেল, ছেলে ফেলে রেখে গিয়েছে। বাচ্চা দুটোকে কোনও এক হোমে পাঠিয়ে সে নতুন সংসারে ব্যস্ত। আর সারাজীবন অসুস্থ মানুষকে সেবার স্পর্শ দিয়ে যাওয়া মানুষটার মৃত্যুমুহূর্তে কোনও প্রিয়জন-পরিচিতজনের উপস্থিতি ছিল না। দশ হাতে আগলে রাখা সংসারটি ফেলে সত্যিকারের কৈলাসের দিকে যখন শিবানী চলে গেল, সে দিন মহালয়া। দেবীপক্ষের সূচনায় সে দিনও এরকম সোনালি আলোয় ভাসছিল চরাচর। শহরের পূজামণ্ডপগুলো থেকে আড়ালে এই মানবীজন্মটুকুও ঠিকঠাক উপভোগ করতে না পারা, দৈবী মহিমাহীন মুখগুলোর ঘাম-তেলের ভিতর জ্বলজ্বল করে ওঠে অদৃশ্য ত্রিনয়ন। শীত করে খুব, এই আশ্বিনেও, অসময়ে— বিপন্নতার।

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

EKHON DUARS, Vol-3, Issue-6 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

রংরুট ও এখন ডুয়ার্সের বই

এখন ডুয়ার্স-এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন

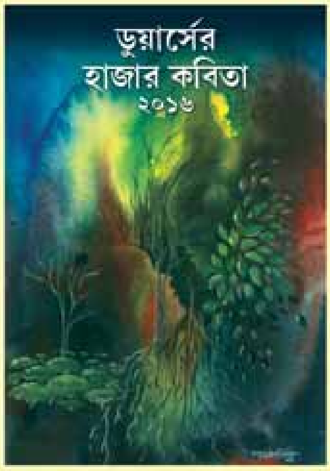

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা ২০১৬ মূল্য ৫০০ টাকা।

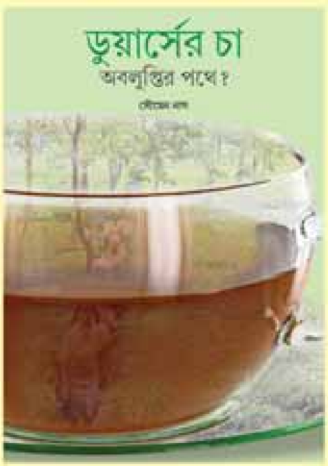

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস মূল্য ২৫০ টাকা।

পাসপোর্ট প্রতিবেশীদের পাড়ায়
দীপিকা ভট্টাচার্য
মূল্য ১৫০ টাকা

নর্থ ইস্ট নট আউট
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
মূল্য ১৫০ টাকা

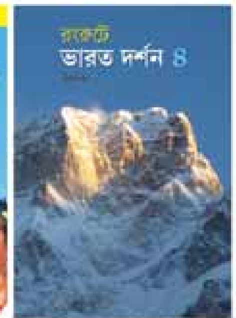

রংরুটে হিমালয় দর্শন।
মূল্য ২০০ টাকা

আমাদের পাখি
তাপস দাশ, উজ্জ্বল ঘোষ
মূল্য ১০০০ টাকা, বইমেলায় ৬৯০ টাকা

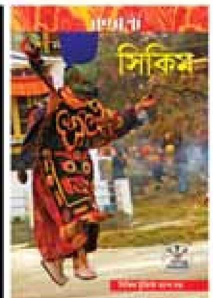

রংরুট সিকিম। রংরুটে প্রকাশিত সিকিম সম্পর্কিত রচনার সংকলন দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। সঙ্গে সিকিমের পূর্ণাঙ্গ টুরিস্ট ম্যাপ।
মূল্য ২০০ টাকা

উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে
প্রদোষ রঞ্জন সাহা
দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ের নানা প্রত্যন্তে ঘুরে বেড়াবার গাইড। মূল্য ২০০ টাকা

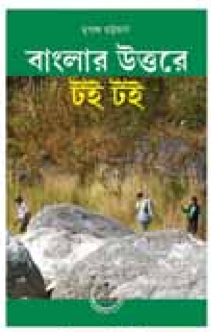

বাংলার উত্তরে টই টই
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
মূল্য ১০০ টাকা।

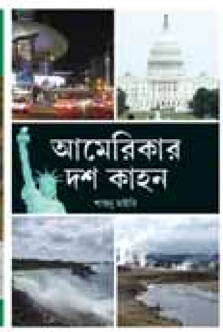

আমেরিকার দশ কাহন
আমেরিকা বেড়াবার একমাত্র গাইড
শান্তনু মাইতি। মূল্য ১২০ টাকা

সুন্দরবন অনধিকার চর্চা
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী
মূল্য ১৫০ টাকা

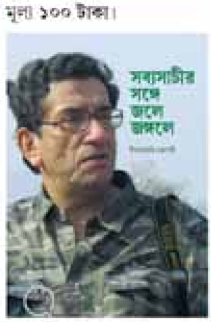

সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী
সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার কাহিনি
মূল্য ১৫০ টাকা

দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে সব্যসাচীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গল ও আফ্রিকার দুই দেশ, কেনিয়া ও তানজানিয়া ঘুরে বেড়াবার কাহিনি। মূল্য ১৫০ টাকা

রংরুট পশ্চিমবঙ্গের জেলা ভিত্তিক পর্যটন গাইড
মূল্য ১০০ টাকা

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.